সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ২৭-২৮
২০ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার

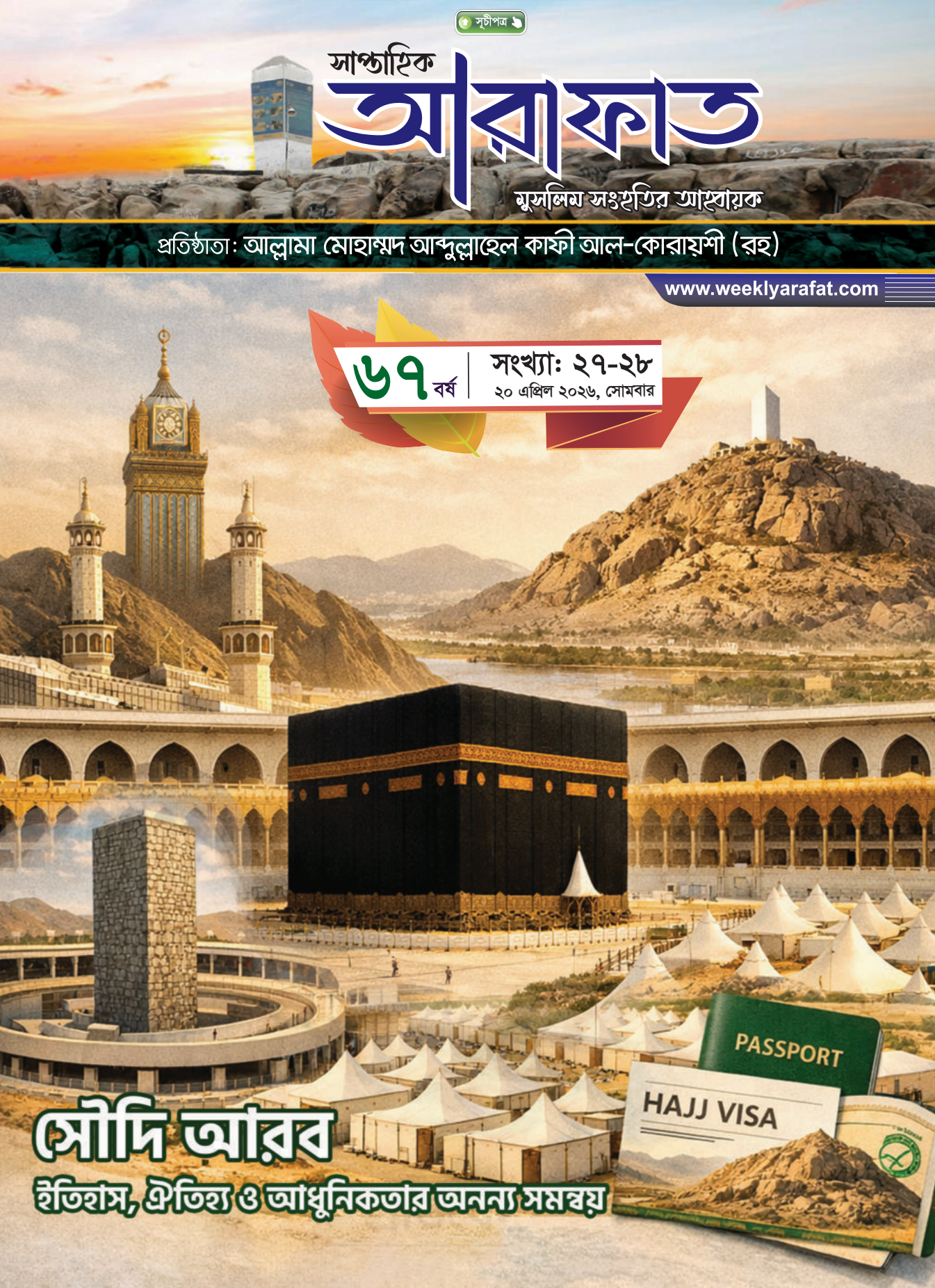

সৌদি আরব

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অনন্য সমন্বয়

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

সূচীপত্র

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আলোয়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

২৭-২৮ সংখ্যা
২০ এপ্রিল-২০২৬ ঈসায়ী
০৭ বৈশাখ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০২ যিলক্বদ-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

- মণির খনি: ০২
- সম্পাদকীয়– কর্মী গঠন: দাওয়াহ আন্দোলনের টেকসই শক্তির মূলভিত্তি ০৪
- দারসুল কুরআন– সত্য প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত পরিণতি: হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার
  আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
- দারসুল হাদীস: 'ইবাদত কবুলের দু'টি শর্ত
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯
- প্রধান রচনা– দারস ও হালাকার পুনর্জাগরণ: ওয়াজ-মাহফিল-এর সংস্কৃতির ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ইল্‌মী ধারা
  আব্দুল হাকীম মাদানী- ১২
- সাময়িক প্রসঙ্গ: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ট্রাম্পকার্ড প্রসঙ্গ
  আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৪
- প্রবন্ধ: আরবি ভাষার ডিজিটাল দলিল দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান
  মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ১৫
- ইসলামী প্রবন্ধ: সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্য ভাণ্ডার আল কুরআনুল কারীম
  মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন- ১৬
  তাওহীদী চেতনার গুরুত্ব
  আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৯
- প্রাসঙ্গিক ভাবনা: ইসলামের আলোকে শ্রমিকের অধিকার
  জান্নাতুল মহল- ২৩
  পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র
  মোঃ কায়ছার আলী- ২৭
- আলোকিত জীবন– ইমাম ইব্‌নুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম
  ড. আহমাদুল্লাহ- ২৯
- ক্বাসাসুল কুরআন– নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন
  আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ৩২
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৬
- শুব্বান সংবাদ ৩৭
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৮
- প্রচ্ছদ পরিচিতি– সৌদি আরব: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অনন্য সমন্বয়
  আবু ফাইয়ায- ৪৭

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

মণির খনি / منجم جواهر

আল্লাহ তা'আলার বাণী

❁ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

✽ "আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান: ১৫৯)*

❁ ﴿وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ﴾

✽ "আর স্মরণ করো, যখন আমরা ইসরাঈল-সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড় আর কারো 'ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রের সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা সকলেই অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ৮৩)*

❁ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾

✽ "মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।" *(সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৯)*

❁ ﴿وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

✽ "আর তুমি মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে তোমার গাল বাঁকা করো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।" *(সূরা লুক্বমা-ন: ১৮-১৯)*

❁ ﴿وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

✽ "আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।" *(সূরা আল-ইস্‌রা: ২৩-২৪)*

❁ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ

خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

✽ "হে ঈমানদারগণ! কোনো মু'মিন সম্প্রদায় যেন অপর কোনো মু'মিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম ডাকা অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তাওবাহ্ করে না তারাই তো যালিম।" *(সূরা আল-হুজুরা-ত: ১১)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ.

❖ "সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা, মানুষ হত্যা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৭১)*

❁ مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ.

❖ "যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৪৫৬)*

❁ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ".

❖ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমল কী? নবী (ﷺ) বললেন: "সময়মতো সালাত, আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৭০)*

❁ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ.

❖ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৮)*

❁ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا.

❖ "আল্লাহ আমার কাছে ওহী করেছেন যেন তোমরা একে অপরের প্রতি বিনয়ী হও।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৪৬)*

❁ قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ".

❖ নবী (ﷺ) বলেন: "গীবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৩৫৭)*

❁ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

❖ "মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯)*

❁ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ.

❖ "অনুমতি তিনবার চাওয়া হয়, যদি অনুমতি না মেলে তবে ফিরে যাও।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮১১)*

❁ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا.

❖ "তোমরা সঠিক পথে চলো (সঠিকভাবে কাজ করো) এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৬৩)*

❁ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

❖ "শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জেতে; বরং শক্তিশালী সেই যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮০৯)*

❁ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا.

❖ "আর আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

কর্মী গঠন: দাওয়াহ আন্দোলনের টেকসই শক্তির মূলভিত্তি

সমকালীন বাস্তবতায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কিংবা যে কোনো আদর্শনিষ্ঠ দাওয়াহ সংগঠনের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে, তা হলো– দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ, আদর্শচেতন ও আল্লাহভীরু কর্মী গঠন। কারণ কোনো সংগঠনের প্রকৃত শক্তি তার সদস্যসংখ্যায় নয়; বরং সেই সদস্যদের মান, নিষ্ঠা, সচেতনতা ও কার্যক্ষমতার মধ্যেই তার আসল পরিচয় নিহিত থাকে।

ইতিহাস আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়! সংখ্যায় অল্প হলেও ঈমান, আদর্শিক দৃঢ়তা, আল্লাহভীতি ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ একটি দলই শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছে। সুতরাং আজকের প্রেক্ষাপটেও মূল প্রশ্ন সংখ্যার নয়; বরং কতজন কর্মী নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াহর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কতজন নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় রয়েছেন এবং কতজন ব্যক্তি নিজেদের জীবনাচরণে আদর্শকে ধারণ করে সমাজে তার ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছেন- এটাই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

বাস্তবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয়ভাবে দাওয়াহ বিস্তার, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সামাজিক কল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এর পূর্ণ প্রতিফলন সর্বত্র সমানভাবে দৃশ্যমান নয়। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কিছু দুর্বলতা; যেমন প্রশিক্ষণের ঘাটতি, দায়িত্ববোধের শৈথিল্য, কার্যকর তদারকির অভাব এবং সংগঠনের ভেতরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানসম্মত ও নিবেদিত কর্মী ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই সফল হয় না। বিভিন্ন গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, যে কোনো আন্দোলনের সাফল্যের মূলভিত্তি হচ্ছে দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানবসম্পদ। তাই কর্মী গঠনকে প্রান্তিক কোনো বিষয় হিসেবে নয়, বরং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের স্থানে নিয়ে আসা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

কর্মী গঠনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি। তাক্বওয়া, ইখলাস, সবর ও দায়িত্ববোধ –এই গুণাবলিতে সমৃদ্ধ না হলে কোনো কর্মী দীর্ঘ পথচলায় স্থির থাকতে পারে না। আত্মিক শক্তিই তাকে প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস জোগায় এবং দাওয়াহর পথে অবিচল রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা আর্-রা'দ: ১১)

আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সুসংহত সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা। এর মধ্যে রয়েছে– শাখা বিস্তার, অধস্তন সংগঠনগুলোর কার্যকর তদারকি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুচিন্তিত ব্যবহার। তবে মনে রাখতে হবে, আত্মিক ভিত দুর্বল হলে বাহ্যিক কাঠামো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে আদর্শিক দৃঢ়তা ছাড়া কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন টেকসই হয়নি।

কার্যকর কর্মী গঠনের জন্য কিছু বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যেমন, নিয়মিত তারবিয়াহ ও শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন, দাওয়াহ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ, তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ, দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলপ্রসূ ফলোআপ ব্যবস্থা চালু করা।

সবশেষে বলা যায়, কর্মী গঠন কোনো সাময়িক কর্মসূচি নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি, ধারাবাহিক ও সচেতন প্রক্রিয়া। আন্তরিকতা, দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে যদি এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে একটি শক্তিশালী, আদর্শনিষ্ঠ ও কার্যকর দাওয়াহ আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

অতএব, সময়ের একান্ত দাবি, কর্মী গঠনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা। কারণ এটিই দাওয়াহ আন্দোলনের টেকসই অগ্রযাত্রার মূলভিত্তি এবং প্রকৃত প্রেরণার উৎস।

📖 درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

সত্য প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত পরিণতি: হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ّۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

" নিশ্চয় যারা কুফ্‌রী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের এবং তাদের শ্রবনশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের চক্ষুসমূহের রয়েছে আবরণ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াত দু'টি মহা গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহত্তম সূরা, সূরা আল-বাক্বারাহ্ হতে চয়ন করা হয়েছে। আয়াতদ্বয় সূরা আল-বাক্বারার ছয় ও সাত নং আয়াত।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

আলোচ্য আয়াতগুলো মদীনার একদল ইহুদি পণ্ডিত এবং মক্কার আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের মতো যারা সত্য স্পষ্টভাবে জানার পরও কেবল অহংকারবশতঃ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়। রাসূল (ﷺ) তাদের ঈমান না আনার কারণে অত্যন্ত ব্যথিত থাকতেন, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে সান্তনা দিয়ে জানান যে, যারা হিদায়াত না পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তাদের দাওয়াত দেওয়া আর না দেওয়া উভয়ই সমান। এই চরম একগুঁয়েমি ও ক্রমাগত সত্য প্রত্যাখ্যানের ফলে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অন্তর ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন; ফলে তাদের হিদায়াত পাওয়ার সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾

"নিশ্চয় যারা কুফ্‌রী করেছে।"

'কুফ্‌র' শব্দটি 'ঈমান' শব্দের বিপরীত। অর্থ অস্বীকার করা, লুকানো ও গোপন করা। শরীয়তের পরিভাষায় 'কুফ্‌র' বলতে বুঝায়– যে বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক সে বিষয়গুলো অস্বীকার করা। সমগ্রমানব জাতি প্রথমতঃ মু'মিন ও কাফির এ দু'টি ভাগেই বিভক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾

অর্থ- "তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কতককে করেছেন কাফির আর কতককে করেছেন মু'মিন।"[২]

কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে আমরা কুফ্‌রীকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। **এক-** বড় কুফ্‌র। **দুই-** ছোট কুফ্‌র।

এক- বড় কুফ্‌র: এটি আবার পাঁচভাবে হতে পারে। যথা-

১. অকাট্য দলিলদ্বারা সত্য সাভ্যস্ত হওয়ার পরেও তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা: যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

---

*সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ। এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৬-৭।

[২] সূরা আত্-তাগা-বুন: ২।

অর্থ- "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগামন হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? এই কাফিরদের আবাসস্থলই জাহান্নাম।"[৩]

২. হিংসা ও অহংকারবশতঃ অবাধ্য হওয়াঃ যেমন- মহান আল্লাহর বাণী–

﴿اَسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"তোমরা আদমকে সিজদাহ্ করো, তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই সিজদাহ্ করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[৪]

৩. ধারণা সম্পর্কিত কুফ্রঃ আল্লাহর রাসূলগণ ও তাঁরা যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস না রেখে ইতস্ততঃ সংশয়-সন্দেহ করা। কুরআনুল কারীমে এই কুফ্রটি বুঝানোর জন্য একটি উপমা পেশ করা হয়েছে।[৫]

৪. দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ থাকাঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ﴾

অর্থ- "আর যারা কুফ্রী করেছে তারা সে বিষয় থেকে বিমুখ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।"[৬]

৫. কপটবিশ্বাসীঃ বিশ্বাসে যাদের কপটতা রয়েছে এমন বিশ্বাসী। এদেরকে মুনাফিক্বও বলা হয়। এ ধরনের কাফিররা এমন মুনাফিক্ব যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾

অর্থ- "এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফ্রী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।"[৭]

দুই- ছোট কুফ্রঃ আর ছোট কুফ্র হলো– মহান আল্লাহর কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করা। এ ধরনের কুফ্রে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না। এ কুফ্র জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকেও অপরিহার্য করে না। কুরআন ও সহীহ সুন্নায় এ ধরনের কুফ্রে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তির ধমক রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতাংশে اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "নিশ্চয় যারা কুফ্রী করেছে" বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে– যারা সত্যকে গোপন করে অভ্যস্ত এবং তাদের ভাগ্যে এই রয়েছে যে তারা কখনো ঈমান আনবে না। এদের চূড়ান্ত পরিণতির জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

অর্থ- "নিশ্চয় যাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না।"[৮]

এ আয়াতের তাফসীরে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার হচ্ছে সেই সব লোক যারা কুফ্রের উপর গোঁ/জেদ ধরে বসে আছে।[৯]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

"আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।"

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক এবং তার অনুসরণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হোক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে এটা জানিয়ে দিলেন যে, ঈমান আনা ও হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়া আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। পূর্বে যার জন্য সৌভাগ্য লিখা হয়েছে সেই শুধু ঈমান আনবে। আর যার জন্য দূর্ভাগ্য লিখা হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হবে।[১০]

নবীজি (ﷺ)-এর বড়ই আশা ছিল যে, সবাই মুসলিম হয়ে যাক এবং সেই অনুপাতে তিনি প্রয়াসও চালিয়ে

---

[৩] *সূরা আল-'আনকাবূত: ৬৮।*
[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ৩৪।*
[৫] *সূরা আল-কাহ্ফ: ৩৫-৩৮।*
[৬] *সূরা আল-আহ্ক্বা-ফ: ৩।*
[৭] *সূরা আল-মুনাফিক্বুন: ৩।*
[৮] *সূরা ইউনুস: ৯৬।*
[৯] *তাফসীর মুফতী তাক্বী উসমানী।*
[১০] *আত্ তাফসীরুস সহীহ।*

যাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঈমান তাদের ভাগ্যেই নেই। এরা এমন কিছু বিশেষ লোক ছিল যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছিল। যেমন- আবূ জাহল এবং আবূ লাহাব প্রভৃতি।

আবূল 'আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ)'র মত এই যে, এই আয়াতটি খন্দকের যুদ্ধে ঐ নেতৃবর্গের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছে–

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾

অর্থাৎ- "আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না যারা আল্লাহর অনুগ্রহকে কুফ্‌রী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের দিকে।"[১১]

কিন্তু যে অর্থ আমরা প্রথম বর্ণনা করেছি সেটাই বেশি প্রকাশমান এবং অন্যান্য আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

আয়াতে ব্যবহৃত 'ইনযার' শব্দের অর্থ, এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। সাধারণ অর্থে 'ইনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা বুঝালেও প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'ইনযার' বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। لَا يُؤْمِنُوْنَ প্রথম বাক্যটির تاكيد হয়েছে। অর্থাৎ- ভয় দেখানো না দেখানো সমান, কোনো অবস্থাতেই তারা ঈমান আনবে না। لَا يُؤْمِنُوْنَ তার خبر হওয়াও সম্ভব। কেননা অনুমিত বাক্য হচ্ছে سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا يُؤْمِنُوْنَ এবং جملة معترضة হয়ে যাবে মহান আল্লাহই প্রত্যেক বিষয়ে সবচেয়ে ভালো ও সুষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ﴾

"আল্লাহ তাদের অন্তরে ও কানে মহর মেরে দিয়েছেন।"

[১১] *সূরা ইব্‌রা-হীম: ২৮।*

এখানে তাদের ঈমান না আনার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাস্‌সির সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, خَتَمَ-এর অর্থ- মোহর করে দেওয়া। মুজাহিদ বলেন, পাপ মানুষের অন্তরে চড়ে বসে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নেয়। এটাই হচ্ছে خَتَمَ (মোহর)। পবিত্র কুরআনে এটা বুঝানোর জন্য আরো তিনটি শব্দ এসেছে। যেমন- رَانَ ও طَبَعَ অর্থের দিক দিয়ে اقفال رَانَ শব্দটি طَبَعَ হতে কম এবং طَبَعَ শব্দটি اقفال হতে কম। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, এখানে সীলমোহর মারার অর্থ হচ্ছে, যখন তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে ও কানে সীলমোহর মেরে দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, এটা তাদেরই অপরাধ। কেননা, তাদের কর্মকাণ্ডই তাদের হৃদয়সমূহকে সীলমোহর মারার উপযুক্ত করে দিয়েছে। আর এ অর্থই কুরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

অর্থ- "কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে।"[১২]

ইমাম তাবারী বলেন, গুনাহ যখন কোনো মনের উপর অনবরত আঘাত করতে থাকে তখন সেটা মনকে বন্ধ করে দেয়। আর যখন সেটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটার উপর সীলমোহর ও টিকেট এঁটে দেয়া হয়। ফলে তাতে আর ঈমান ঢোকার কোনো পথ পায় না। যেমনিভাবে কুফ্‌রী থেকে মুক্তিরও কোনো সুযোগ থাকে না। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত خَتَمَ আর অন্য আয়াতে বর্ণিত طَبَعَ।[১৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ﴾

[১২] *সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন: ১৪।*
[১৩] *তাফসীরে ত্বাবারী।*

অর্থ- "এদেরই হৃদয়ে কানে ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন আর এরাই উদাসীন।"[১৪]

হাদীসে এসেছে– মানুষ যখন কোনো একটি গুনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ পড়ার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথম অবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তাওবাহ্ না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।[১৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾

"আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ।"

অন্তর ও কানের উপর পরে সীল (خَتَمَ ও طَبَعَ) আর কানের উপর পরে পর্দা (غِشَاوَةٌ) যেমন- আল্লাহ বলেন–

﴿وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً﴾

অর্থ- "এবং তিনি তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ।"[১৬]

অন্যত্র তিনি বলেন–

﴿فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ﴾

অর্থ- "আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন।"[১৭]

এ আয়াতগুলোতে অন্তরে ও কানের উপর خَتَمَ-এর উল্লেখ আছে এবং চোখের উপর আছে غِشَاوَةٌ (পর্দা)'র উল্লেখ। এ আয়াতে সম্ভবতঃ جَعَلَ ক্রিয়াপদ উহ্য আছে এবং وَعَلٰى سَمْعِهِمْ-এর অনুসরণে غِشَاوَةٌ শব্দটিকে نصب (যবর) দিয়ে পড়তে হবে। যেমন- কুরআনের আয়াত وَ حُوْرٌ عِيْنٌ-এর মধ্যে হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আরব কবির একটি কবিতা উল্লেখ করা যায়। কবি বলেন– علفتها تبنا وماء باردا + حتى شتت همالة عيناها এখানে سقيتها উহ্য থেকে ماء শব্দকে نصب (যবর) দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

"আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

যারা মহান আল্লাহর পথে চলে না, যারা সত্যকে অস্বীকার করে বা যারা কপটতা করে, তাদের জন্য তাদের চূড়ান্ত প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ ও বিশাল শাস্তির কথা আলোচ্য আয়াতাংশে বলা হয়েছে।

আমাদের জীবনে এর শিক্ষা

১. অহংকার ও একগুঁয়েমি বর্জন: সত্য জানার পর তা মেনে না নিয়ে জেদ বা অহংকার করা ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ। তাই সবসময় সত্য গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে।

২. বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষা: মানুষ যখন বারবার সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করে, তখন তার বিবেক বা হিদায়াত পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে যায়। একেই কুরআনের ভাষায় 'অন্তরে মোহর পড়া' বলা হয়েছে।

৩. সময়ের গুরুত্ব ও সুযোগ গ্রহণ: হিদায়াতের সুযোগ সবসময় থাকে না। সত্যের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথে তা গ্রহণ করা উচিত, নতুবা পরে চাওয়ার পরও মন থেকে তা গ্রহণ করার তাওফীক্ব নাও হতে পারে।

৪. কাজের ফলাফল মহান আল্লাহর হাতে: দাওয়াতি কাজ বা কাউকে ভালো কথা বলার দায়িত্ব আমাদের, কিন্তু সে তা মানবে কি না, বা হেদায়েত পাবে কি না, তা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তাই ফল না পেলে হতাশ হওয়া যাবে না।

৫. পরিণতির ভয় রাখা: সত্য বিমুখ হওয়ার চূড়ান্ত ফল হলো মহান আল্লাহর কঠিন শাস্তি। তাই পরকালের কথা স্মরণ করে দুনিয়ার জীবনে অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

---

[১৪] *সূরা আন্-নাহ্ল: ১০৮।*
[১৫] *আত্-তিরমিযী- হা. ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৪৪।*
[১৬] *সূরা আল-জা-সিয়াহ্: ২৩।*
[১৭] *সূরা আশ্-শূরা-: ২৪।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

‘ইবাদত কবুলের দু’টি শর্ত

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

সরল বঙ্গানুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পাক-পবিত্রতা ছাড়া সালাত এবং হারাম ধন-সম্পদের দান কবুল হয় না।[১৮]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে মুলত দু’টি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে–

এক: পাক-পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না।

দুই: হারাম ধন-সম্পদের দান কবুল হয় না।

এক: পাক-পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল হয় না

হাদীসের প্রথম অংশে বলা হয়েছে–

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

অর্থাৎ- পাক-পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল হয় না।

সালাত ফরয ‘ইবাদত। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। ঈমান গ্রহণ করার পর মানুষের ওপর প্রধান ‘ইবাদত হলো সালাত আদায় করা। আর এ সালাত কবুল হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত। কেননা পবিত্রতা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সালাত পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। পবিত্রতা ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্রতা অর্জনকারীর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ্কারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।”[১৯]

আল্লাহ তা‘আলা মসজিদে কুবার অধিবাসীদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

“সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।”[২০]

কবরের কঠিন ‘আযাব থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হলো অপবিত্র বস্তু থেকে দূরে থাকা। যেমন- হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ "إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ! أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ". ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَقَالَ "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا".

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) দু’টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, এ দু’জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তিনি (একটি

---

*প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩০১।*

[১৯] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২২।*

[২০] *সূরা আত্-তাওবাহ: ১০৮।*

কবরের দিকে ইশারা করে) বললেন, এই ব্যক্তি পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর (অপর কবরের দিকে ইশারা) করে বললেন, এই ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনিয়ে সেটি দু' টুকরা করে একটি এ কবরে এবং অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন এবং বললেন: আশা করা যায়, ডাল দু'টি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে।[২১]

পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না। এ পবিত্রতা বলতে সব ধরনের অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা আবশ্যক, তাও এ পবিত্রতার জন্য শমিল। আবার যার ওযূ নেই, তাও এ পবিত্রতায় শামিল। সুতরাং ওযূ হোক আর গোসল হোক সালাতেরর জন্য সার্বিক পবিত্র অর্জন জরুরি।

এ কারণেই সালাতের জন্য শরীর, পোশাক, সালাতের স্থান পবিত্র হওয়া জরুরি। শুধু তাই নয়, সালাত কবুলে হালাল আয়ে অর্জিত সম্পদ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাও আবশ্যক। কেননা 'ইবাদত কবুলের জন্য হালাল আয়-রোজগারকে শর্ত করা হয়েছে।

দুই: হারাম ধন-সম্পদের দান কবুল হয় না

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে–

وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

অর্থাৎ- হারাম ধন-সম্পদের দান কবুল হয় না।

দান-সাদাক্বাহ্ মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে মানুষ পাপমুক্ত হতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلَاةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা নেক 'আমলসমূহ খেয়ে ফেলে, যেমন- আগুন জ্বালানী কাঠ খেয়ে ফেলে। দান-খায়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয় (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেমন- পানি আগুনকে বিলীন করে (নিভিয়ে) দেয়। সালাত মু'মিনের নূর (আলো) এবং সিয়াম জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢাল।[২২]

তবে দান-সাদাক্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও পাপমুক্তির জন্য শর্ত রয়েছে, তা হলো– হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে দান-সাদাক্বাহ্ করতে হবে। হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ দান করলে কোনো সওয়াব নেই। সালাত পড়তে যেমন ওযূ আবশ্যক, নইলে সেই সালাতের কোনো মূল্য নেই, তেমনি হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দান করাও মানুষের কোনো উপকারে আসে না।

যার জীবন-জীবিকা হারাম, পেটে হারাম খাদ্য, পরনে হারাম পোশাক, সে অবস্থা থেকে তাওবাহ্ করে ও মানুষের হক্ব আদায়ে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করা অনর্থক। কারণ দু'আ কবুল হওয়ার জন্য এগুলো সব হালাল হওয়া শর্ত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾ وَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, হে মানুষেরা! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও পবিত্র। তিনি উত্তম ও পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না। তিনি রাসূলদেরকে যে আদেশ করেছেন, মু'মিনদেরও তা-ই আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম ও পবিত্র খাবার থেকে

[২১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২০।*

[২২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২১০।*

ভক্ষণ করো এবং নেক ‘আমল করো। তোমরা যা করো, তা সম্পর্কে আমি সর্বজ্ঞাত।”[২৩] তিনি আরো বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যে উত্তম ও পবিত্র রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে ভক্ষণ করো।”[২৪] এরপর রাসূল (ﷺ) এমন ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে ধুলোমলিন চেহারা ও এলোকেশ নিয়ে আকাশের পানে হাত বাড়িয়ে দু‘আ করে, ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং শিশুকালেও সে হারাম দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে।[২৫]

হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ কম হলেও তাতে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে। তা থেকে সাদাক্বাহ্কৃত সামান্য সম্পদও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে সাদাক্বাহ্কারীর উপকারে আসবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন, কোনো ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জিত একটি খেজুর দান করলে আল্লাহ তা‘আলা ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তোমাদের কেউ যেভাবে উটের বা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করে থাকে, তিনিও সেভাবে এটা বাড়াতে থাকেন। অবশেষে তা পাহাড় অথবা এর চেয়েও অনেক বড় হয়।[২৬]

দান-সাদাক্বাহ্ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদত। দান-সাদাক্বাহ্য় আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ায় মানুষের যাবতীয় বিপদ-আপদ এমনি রোগ থেকেও মুক্তি দান করেন। আর পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য দান-সাদাক্বার উপকারিতাও সীমাহীন। এ কারণেই কষ্টার্জিত আয় থেকে দান-সাদাক্বাহ্ করতে হবে। যদিও খিয়ানতের মাধ্যমে অর্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা দান-সাদাক্বাহ্ কবুল হবে না বলে হাদীসে এসেছে। তথাপিও খিয়ানতের মাল, গনিমতের মাল, চুরির মালসহ যাবতীয় অন্যায় পন্থায় অর্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা দান-সাদাক্বায় কোনো উপকার নেই। আর তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুলও হবে না।

[২৩] *সূরা আল-মু’মিনূন: ৫১।*
[২৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৭২।*
[২৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯৩; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৮৯।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৩৩।*

আপনার অধীনে যদি হারাম উপার্জন থাকে তাহলে আপনার উচিত এতদিনের সেই হারাম উপার্জন থেকে তাওবাহ্ করা এবং প্রকৃত মালিককে, কিংবা মালিক না পাওয়া গেলে মালিকের ওয়ারিসদের নিকট তা ফিরিয়ে দেওয়া। যতক্ষণ মূল মালিক বা মালিকের ওয়ারিসদের পাওয়া যাবে, ততক্ষণ ভিন্ন কোনো সুযোগ নেই। মূল মালিক বা ওয়ারিসদের পরিচয় জানা না থাকলে বা খুঁজে বের করা সম্ভবপর না হলে, ওই সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত শুধু হারামের দায়ভার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে মূল মালিকের পক্ষ হতে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত গরীবদের মাঝে সাদাকা করে দিতে হবে কিংবা মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে বা জিহাদের কাজে ব্যয় করতে হবে। যাতে মালিক তার সম্পদ না পেলেও এর সওয়াবটুকু পেয়ে যান। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ-২) বলেছেন,

ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابه فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما يحصل له من أجر الجهاد.

যে ব্যক্তি হারাম থেকে দায়মুক্ত হতে চায় এবং তাওবাহ্ করতে চায়; অথচ তা মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভবপর নয়, তাহলে সে যেন তা মালিকের পক্ষ থেকে জিহাদের পথে খরচ করে। এটা দায়মুক্তির উত্তম পথ এবং এতে সে জিহাদে অংশ গ্রহণেরও সওয়াব পাবে।[২৭]

উপসংহার

সুতরাং মু’মিন মুসলমানের উচিত, ওযূর সঙ্গে সম্পৃক্ত ফর্য ‘ইবাদতগুলোর জন্য ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। তবেই সালাত আদায় হবে। আর দান-সাদাক্বার সাওয়াবের জন্যও হালাল উপায়ে আয়ের অর্থের বিকল্প নেই। তাই বৈধ পন্থায় উপর্জিত অর্থ থেকে দান-সাদাক্বাহ্ করার আবশ্যক।

[২৭] *মাজমূউল ফাতাওয়া- ২৮/৪২১-৪২২।*

مقالةرئيسة / প্রধান রচনাঃ

দারস ও হালাকার পুনর্জাগরণঃ ওয়াজ-মাহফিল-এর সংস্কৃতির ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ইল্‌মী ধারা

আব্দুল হাকীম মাদানী*

সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের জনসাধারণের মাঝে ইল্‌ম অর্জন ও বিতরণের যে মূলধারা প্রচলিত, তা হলো দারস-তাদরীস ও ইল্‌মী হালাকা। মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই শিক্ষাব্যবস্থায় দৈনন্দিন সালাতের পর সংক্ষিপ্ত দারস, সাপ্তাহিক ও মাসিক হালাকা, এমনকি মৌসুমভিত্তিক ইল্‌মী আসর অনুষ্ঠিত হয়। এসব আসরে নেই কোনো জাঁকজমক, নেই অপ্রয়োজনীয় খরচ বা বাহ্যিক চাকচিক্য; বরং থাকে আন্তরিকতা, ধারাবাহিকতা এবং গভীরভাবে দ্বীন শেখার পরিবেশ। একজন সাধারণ মুসলিম এই ধারাবাহিক হালাকায় অংশগ্রহণ করে ধীরে ধীরে কুরআন, হাদীস, 'আক্বীদাহ্ ও ফিকহের প্রাথমিক থেকে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতিই ইতিহাস জুড়ে আলেম তৈরির মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।*

কিন্তু ভারত উপমহাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশে, এই স্বাভাবিক ও ফলপ্রসূ পদ্ধতির জায়গা অনেকাংশে দখল করে নিয়েছে ওয়াজ মাহফিলকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র এখন ওয়াজ মাহফিল, সম্মেলন, ইজতেমা ও কনফারেন্সের ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বড় বড় আয়োজন করা হয়, যেখানে মানুষের ভিড় হয়, আবেগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ইল্‌ম অর্জনের ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না। ওয়াজ শুনে মানুষ সাময়িকভাবে প্রভাবিত হলেও, নিয়মিত শিক্ষার অভাবে সেই প্রভাব স্থায়ী হয় না এবং দ্বীনের গভীর উপলব্ধিও গড়ে ওঠে না।

এ অবস্থার একটি বড় কারণ হলো মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। এখন অনেকেই তাৎক্ষণিক আবেগ ও প্রভাবকে বেশি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায় ও নিয়মিত ইল্‌ম অর্জনের ধৈর্য কমে গেছে। অন্যদিকে, কিছু আলেমও স্থানীয় মসজিদভিত্তিক দারসকে গুরুত্ব না দিয়ে দূর-দূরান্তে ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণে বেশি আগ্রহী হন, যেখানে সম্মানী ও জনপ্রিয়তার সুযোগ বেশি থাকে। ফলে যাদের নিজ এলাকার মানুষকে নিয়মিত ইল্‌ম দেওয়ার কথা, তারা সেই দায়িত্ব থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছেন। এতে মসজিদভিত্তিক দারস ও হালাকা দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সাধারণ মানুষ স্থায়ী ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই প্রবণতার ফলে সমাজে একধরনের উপরিভাগী ধর্মীয় চেতনা তৈরি হচ্ছে। মানুষ দ্বীন সম্পর্কে অনেক কথা শুনছে, কিন্তু সুসংগঠিতভাবে শিখছে না। 'আক্বীদাহ্, ফিকহ ও উসূলের মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এর প্রভাব আরো ভয়াবহ হতে পারে। ইল্‌মী শূন্যতা তৈরি হবে, ভুল 'আক্বীদাহ্ ও বিদআত ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রকৃত আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। তখন দ্বীন মানুষের কাছে জ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থা না হয়ে আবেগনির্ভর একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

তবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ বন্ধ নয়। সর্বপ্রথম প্রয়োজন মসজিদভিত্তিক দারস ও হালাকা পুনরুজ্জীবিত করা। প্রতিদিন সালাতের পর সংক্ষিপ্ত দারস, সাপ্তাহিক নির্ধারিত হালাকা এবং মাসিক বিশেষ শিক্ষাচক্র চালু করা যেতে পারে। এসব দারসকে পরিকল্পিত ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক করতে হবে, যাতে একজন শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি আলেমদেরও তাদের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে জনপ্রিয়তার চেয়ে ইল্‌ম প্রচারকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং নিজ এলাকার মানুষের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও সচেতনতা তৈরি করতে হবে যে, শুধু ওয়াজ শোনা দ্বীন শেখার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিত হালাকায় অংশগ্রহণই প্রকৃত ইল্‌ম অর্জনের পথ। বড় বড় মাহফিলে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তার একটি অংশ যদি মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে সমাজ অনেক বেশি উপকৃত হবে। পাশাপাশি তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রশ্নোত্তরভিত্তিক ক্লাস, আলোচনা সভা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন দারস চালু করা যেতে পারে।

তবে ভারসাম্য রক্ষা করাও জরুরি। ওয়াজ মাহফিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নয়; এটি অনেক সময় গাফেল মানুষকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করে। কিন্তু এটিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য না ভেবে একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে দেখা উচিত। প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত ইলমী হালাকা ও ধারাবাহিক দারসের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

অতএব, উম্মাহর প্রকৃত পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে আমাদের আবার সেই মূল ধারায় ফিরে যেতে হবে, যেখানে মসজিদ হবে ইল্‌মের কেন্দ্র, দারস ও হালাকা হবে জ্ঞানের প্রধান মাধ্যম এবং আলেম ও সাধারণ মানুষ উভয়ে মিলেই একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ, সচেতন ও সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তুলবে। তখনই ইন্ শা-আল্লাহ দ্বীনের সঠিক চেতনা মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উম্মাহ তার হারানো শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হক্ব বুঝার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

* *আল-ইল্‌ম ইন্সটিটিউট, রাজশাহী।*

মসজিদভিত্তিক দা'ওয়াহ ও তা'লীম প্রকল্প

উদ্দেশ্য: মসজিদকে কেন্দ্র করে দ্বীনি শিক্ষা ও দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করা, শাখা জমঈয়তসমূহকে সক্রিয় ও কার্যকর করা এবং জমঈয়তের নেতৃত্বে দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ দাঈ' ও সংগঠক তৈরি করা।

ব্যানার / সাইনবোর্ড (নমুনা)	جمعية الدعوة والتعليم والارشاد ...المركز تحت إشراف جمعية أهل الحديث ببنغلاديش مسجد الجامع

প্রধান কর্মসূচী: ১. শিশুদের মক্তব, **২.** বয়স্কদের মক্তব, **৩.** সাপ্তাহিক দারস ও হালাকা, **৪.** 'ঘরে ঘরে দা'ওয়াত' কর্মসূচী, **৫.** সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা, **৬.** যাকাত ও কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা।

কার্যক্রমের বিবরণ: মক্তব কার্যক্রম– মসজিদভিত্তিক মক্তবের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা হবে। এর অন্তর্ভুক্ত– **ক)** সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা, **খ)** সালাত আদায়ের নিয়মাবলি, **গ)** দৈনন্দিন দু'আ ও যিক্র শিক্ষা, **ঘ)** ওযূ, তায়াম্মুম ও বিভিন্ন প্রকার সালাতের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

সাপ্তাহিক দারস ও হালাকা: ক) কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্ধারিত সিলেবাস ও গ্রন্থ অনুসরণ করা হবে, **খ)** নির্ধারিত দাঈ' বা আলেম দারস পরিচালনা করবেন, **গ)** অংশগ্রহণকারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

'ঘরে ঘরে দা'ওয়াত' কর্মসূচী: ক) দা'ওয়াতি দল গঠন করে নির্ধারিত এলাকায় বাড়ি বাড়ি সফর, **খ)** উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদান, **গ)** পরিবারগুলোকে সালাত ও মসজিদমুখী জীবনে উদ্বুদ্ধ করা, **ঘ)** পরিবারভিত্তিক তথ্য (আদমশুমারী) সংগ্রহ এবং তা জেলা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তে প্রেরণ।

সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা: ক) প্রতি মাসে দাঈ' টিমের পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে, **খ)** কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করা হবে, **গ)** সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (WhatsApp, Facebook) ব্যবহার, **ঘ)** শিক্ষা কার্যক্রমে মূল্যায়ন, প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও সনদ প্রদান ব্যবস্থা রাখা।

যাকাত ও কল্যাণ তহবিল: ক) সক্ষম ব্যক্তিদের যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে কেন্দ্রীয় তহবিলে সংযুক্ত করা, **খ)** শাখা পর্যায়ে কল্যাণ তহবিল গঠন ও ডোনার তৈরি, **গ)** দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তায় তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কার্যক্রম শুরুর সময়: এপ্রিল / মে-২০২৬ ঈসায়ী

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

ক) বাস্তবায়ন কাঠামো: ১) কেন্দ্রীয় দা'ওয়া বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচী পরিচালিত হবে, **২)** জেলা জমঈয়তের নেতৃত্বে দাঈ' টিম মাঠপর্যায়ে কাজ করবে, **৩)** মসজিদ কমিটি ও ইমামদের সক্রিয় সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, **৪)** প্রয়োজন অনুযায়ী ইমামদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ ও সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে।

খ) অর্থায়ন (ফান্ডিং): ১) জেলা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সমন্বয়ে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, **২)** স্থানীয় দাতা ও সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

গ) দাঈ' টিম গঠন: ১) যোগ্য ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে দাঈ টিম গঠন, **২)** কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও তদারকি।

ঘ) তথ্য ব্যবস্থাপনা: ১) মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ, **২)** জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা।

সিলেবাস ও পাঠ্যবই (প্রাথমিক পর্যায়):

১. ইসলামী 'আক্বীদাহ্: আকীদাই সর্বপ্রথম –ড. খালিদ বিন আলী আল মুশাইকাহ।

২. তাহারাত ও সালাত শিক্ষা: সচিত্র ওযূ ও সালাত শিক্ষা –শাইখ আব্দুর রব আফফান মাদানী।

৩. দৈনন্দিন দু'আ ও যিক্র: হিসনুল মুসলিম –ড. সাঈদ বিন আলী আল কাহতানী।

৪. কুরআন শিক্ষা: সহজ ও মানসম্মত কায়দা (যেমন- নূরানী/বাগদাদী কায়দা) অনুসরণ করা হবে।

উপসংহার: এই প্রকল্পের মাধ্যমে মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি সুসংগঠিত, টেকসই ও ফলপ্রসূ দা'ওয়াহ ও তা'লীম ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে দ্বীনি চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা যাবে।

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গঃ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ট্রাম্পকার্ড প্রসঙ্গ

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

ইতিমধ্যে একচল্লিশ দিনে গড়িয়েছে, ইরান বনাম আমেরিকা-ইসরাঈল যুদ্ধ। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির স্বাক্ষী হয়ে রইলো বিশ্ব। তিলে তিলে গড়ে ওঠা সভ্যতার ভিত্তিভূমিকে ওরা ছারখার করতে চেয়েছে। করেছেও। অজুহাত ছিল মনগড়া। যেমনটি করেছিল ইরাকের বিরুদ্ধে। মরণাস্ত্র ধ্বংসের অজুহাতে ইরাক ধ্বংস করে মারণাস্ত্রের কিছুই পাইনি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার আকরভূমিকে তারা তছনছ করে দেয়।*

আসলে যুদ্ধ তো যুদ্ধই। যুদ্ধ শব্দটি সংস্কৃত 'যুধ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যুধ্ ধাতুর অর্থ লড়াই করা, সংঘর্ষ করা কিংবা মোকাবেলা করা। এই ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যোগ হয়ে 'যুদ্ধ' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ- যুদ্ধ শব্দের মূল অর্থ হলো– দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, লড়াই বা মোকাবেলা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমত, যখন দু'টি রাষ্ট্র বা শক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগলিক স্বার্থে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তাকে যুদ্ধ বলে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলশ্রুতি ধ্বংস, সৃষ্টি নয়।

যুদ্ধের ফলে প্রাণহানি ও স্থাপনার ধ্বংস মানুষকে অসহায় করে তোলে। মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনামলে সংঘটিত কলিঙ্গ যুদ্ধ, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক ভয়াবহ যুদ্ধ। খ্রিষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দে সংঘটিত কলিঙ্গ যুদ্ধ ছিল রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, বন্দি হয় দেড় লক্ষ মানুষ। গৃহহীন ও আহতের সংখ্যাও ছিল ব্যাপক। যুদ্ধের ফলে কলিঙ্গের বহুগ্রাম ও নগর ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের বসতভিটা পুড়ে যায়। কৃষি ক্ষেত্র নষ্ট হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ঘটে চরম মানবিক বিপর্যয়। অসংখ্য নারী বিধবা হয়, শিশু পিতৃহীন হয়। পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষে সর্বত্র কান্না হাহাকার ও দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এই তো হলো যুদ্ধের নতিজা। ইরান ও আমেরিকা-ইসরাঈল যুদ্ধে আমরা তাই-ই দেখতে পাই। গাজাসহ ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইতোমধ্যে ৮০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। হারিয়েছে তাদের সহায়-সম্বল ও বসতভিটা। নিত্যদিনই হত্যাযজ্ঞের বিভীষিকা মানুষকে হতবাক করে তুলেছে।

ইরানের ওপর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যৌথভাবে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈল। পাল্টা জবাবও ছিল ইরানের। যুদ্ধ শুরুর ৪১তম দিনে এসে যুদ্ধ বিরতির কথা শুনেছি। কিন্তু ইতোমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচ.আর.এ.এন-এ জানায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানে মোট ৩ হাজার ৬৩৬ জন নিহত হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে গত মার্চ দেশটিতে ১ হাজার ৫৩০ জন নিহত হয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে দু'টি পৃথক ঘটনায় জাতিসংঘে তিনজন শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ইরাকে ১১৭ জন, ইসরাঈলে ১১ জন, সেনা সদস্যসহ ৩৪ জন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ১৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে অন্তত ২৫ ডজন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে দু'জন সেনাসহ ১৩ জন, কাতারে সাতজন, কুয়েতে সাতজন, পশ্চিম তীর (ফিলিস্তিনে) চারজন নিহত হয়েছে। এছাড়া সিরিয়া, বাহরাইন ও ওমানে যথাক্রমে ৪, ২ ও ২ জন। গোলার আঘাতে রাজধানী রিয়াদের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আল খারজ শহরের একটি আবাসিক এলাকায় ২ জন নিহত হয়েছে। সব মিলিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। ১৩টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি। যুদ্ধ বিমান, ড্রোন, রাডার ধ্বংস হয়েছে। উল্লিখিত সামরিক দিক ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ক্ষতি হয়েছে। তেলের দাম ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি বেশ টালমাটাল। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। দেখা দিয়েছে অর্থনীতি সংকট। সব মিলিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। সুতরাং যুদ্ধ কাম্য নয়। কিন্তু অধূনা বিশ্বে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি ঘাড়ে চেপে বসেছে।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট অপহৃত হয়েছেন। মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাকে ছিনতাই করা হয়েছে। ইরানকেও অলিখিত অপবাদ দিয়ে চেপে ধরেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে শক্তি অর্জনকারী দেশ ইরান তাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

مقالة / প্রবন্ধঃ

আরবি ভাষার ডিজিটাল দলিল দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম *(লেখক, অনুবাদক ও গবেষক, কাতার প্রবাসী)*

ভাষা কেবল মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম নয়; ভাষা একটি সভ্যতার স্মৃতিভাণ্ডার, একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ভাষা, যার শব্দভাণ্ডার বহন করে চলেছে সহস্র বছরের ধর্মীয়, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এই দীর্ঘ ও বহুমাত্রিক ভাষাগত যাত্রাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিশ্বমানের একটি কাঠামোয় উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাতারভিত্তিক পরিচালিত এক যুগান্তকারী উদ্যোগের নাম–معجم الدوحة التاريخي للغة العربية (Doha Historical Dictionary of Arabic)।

সম্প্রতি রাজধানী দোহার ফেয়ারমন্ট ও র‍্যাফেলস হোটেলের কাতার হলে এই মহাপ্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাতারের মহামান্য আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির উপস্থিতি প্রকল্পটির গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি নতুন করে স্পষ্ট করে তোলে। অনুষ্ঠানে অভিধানের নতুন অনলাইন পোর্টাল নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক মন্ত্রী, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন আরবি ভাষা একাডেমির সভাপতি, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, অভিধান পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ভাষাবিশেষজ্ঞ, গবেষকগণ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান কোনো সাধারণ শব্দার্থকোষ নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক প্রকল্প, যেখানে আরবি ভাষার শব্দগুলোর জন্ম, ক্রমবিকাশ, অর্থগত পরিবর্তন এবং বিভিন্ন যুগে ব্যবহারের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রামাণ্য দলিলসহ সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন আরবি ও জাহেলি যুগের ভাষা, কুরআনিক আরবি, 'আব্বাসীয় ও মধ্যযুগীয় আরবি থেকে শুরু করে আধুনিক মানের আরবি (Standard Arabic)–সব স্তরের শব্দ ও অর্থগত বিবর্তন এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অভিধানটির মূল লক্ষ্য হলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবি শব্দ কীভাবে তার অর্থ, ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিকতা পরিবর্তন করেছে–তার নির্ভরযোগ্য উৎস, সাহিত্যিক উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে তুলে ধরা। এটি একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, dohadictionary.org ওয়েবসাইট অথবা The Doha Historical Dictionary of Arabic অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এটির বহুবিধ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে অভিধানটিকে গবেষণাবান্ধব, দ্রুত এবং সহজলভ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা এখানে–নির্দিষ্ট কোনো আরবি শব্দ লিখে অনুসন্ধান করতে পারেন, অথবা শব্দের মূল ধাতু বা মাদ্দা ব্যবহার করে বিস্তৃত গবেষণা চালাতে পারেন এবং প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে জানতে পারেন তার আদি অর্থ, বিভিন্ন যুগে ব্যবহারের উদাহরণ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উৎস, এমনকি সময়ের সঙ্গে অর্থগত পরিবর্তনের বিশ্লেষণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অভিধানটিকে কেবল শিক্ষার্থীদের নয়; বরং গবেষকদের জন্যও একটি অপরিহার্য ডিজিটাল রেফারেন্সে পরিণত করেছে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থী, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ এবং গবেষকদের জন্য দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান এক অমূল্য সম্পদ। সাধারণ অভিধান যেখানে একটি শব্দের বর্তমান অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে এই ঐতিহাসিক অভিধান দেখায়–কোন শব্দ কোন সময়ে কী অর্থ বহন করত, কীভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাবে তার অর্থ রূপান্তরিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোন শব্দে ধর্মীয় অর্থ কখন যুক্ত হলো, কোন যুগে তা দার্শনিক বা সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করল, কিংবা আধুনিক সময়ে এসে কীভাবে তার অর্থ আরো বিস্তৃত বা সংকুচিত হলো–এসব প্রশ্নের উত্তর এখানে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে পাওয়া যায়।

এই প্রকল্পটি কেবল ভাষাবিদ্যার অগ্রগতি নয়; বরং কাতারের সাংস্কৃতিক দূরদৃষ্টিরও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। দোহা থেকে পরিচালিত এই উদ্যোগ আরবি ভাষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এটি দেখিয়ে দিয়েছে–আধুনিক আরব বিশ্ব কীভাবে প্রযুক্তি ও মানবিক বিদ্যার সমন্বয়ে নিজেদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বিশ্ব দরবারে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান নিছক একটি ডিজিটাল অভিধান নয়; এটি আরবি ভাষার একটি চলমান ইতিহাস, একটি জীবন্ত আর্কাইভ। যারা আরবি ভাষাকে শুধু শেখার বিষয় হিসেবে নয়; বরং বোঝার, অনুধাবনের এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করার আগ্রহ রাখেন–তাদের জন্য এই অভিধান এক অনন্য জানালার মতো। আরবি ভাষার শব্দসম্ভারের এই বিশাল ঐতিহাসিক কোষাগার আমাদের মনে করিয়ে দেয়–ভাষা কখনো স্থির নয়। ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকে, বদলায় এবং নতুন অর্থ ধারণ করে। দোহা ঐতিহাসিক আরবি অভিধান সেই পরিবর্তনেরই এক বিশ্বস্ত, আধুনিক ও প্রামাণ্য দলিল।

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধঃ

সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্য ভাণ্ডার আল কুরআনুল কারীম

মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন*

নিকট অতীতের একটা সময়কে বলা হতো বিজ্ঞানের যুগ। মানুষের মুখে মুখে ছিল বিজ্ঞানের জয়গান। বিজ্ঞানের স্তুতি প্রকাশে জ্ঞানী মানুষের কোনো প্রকার কৃপণতা ছিল না। পত্রপত্রিকায় টেলিভিশনে সর্বত্রই বিজ্ঞানের কল্যাণ ও আশীর্বাদের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হতো। যারা যত বেশি বিজ্ঞানমনস্ক তারা তত বেশি আধুনিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এমনটাই ধারণা করা হতো। স্কুল-কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য চেষ্টা অব্যাহত ছিল সকল পর্যায়ে। পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান নামকরণ অতি সাধারণ ব্যাপার হলেও শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিরোনামের সাথে লেজ জোরে দেয়া হলো বিজ্ঞান শব্দটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সমাজবিজ্ঞান কৃষিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সমুদ্র বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানুষের চিন্তা জগতের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চলে গেল বিজ্ঞানের হাতে। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের সামনে আর কোনো দ্বার উন্মুক্ত রইল না। সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের জালে আটকা পড়ে গেল। তাইতো মানবিক ও ব্যবসায়ী বিভাগের শিক্ষার্থীরা যতই বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করল তারা ব্যর্থ হলো। তারা বিজ্ঞানের পাঠ হজম করতে না পারলেও গলাধঃকরণ করতে তাদেরকে বাধ্য করা হলো। বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ ও সাহিত্যকর্মের প্রতি মানুষকে তাড়িত করা হলো। সাইন্স ফিকশনগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা বিজ্ঞান নির্ভর করার জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সংযোজিত হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মানব কল্যাণে বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান কৃষি কাজে বিজ্ঞান শিরোনামের প্রবন্ধ। ধর্ম শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ের গুরুত্ব কমে গেল মানুষের কাছে। মানুষ শতভাগ বিজ্ঞান নির্ভর হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল আদাজল খেয়ে।

বিজ্ঞানের ক্রমাগত আবিষ্কার মানুষের জীবনকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করে তুললো। বিজ্ঞান নির্ভর পৃথিবীতে মানুষ আবিষ্কার করল এক বিস্ময়কর যন্ত্র। যার নাম কম্পিউটার। আধুনিক বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল কম্পিউটার নামক এই যন্ত্রের কাছে। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের আধুনিক জীবন যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি কম্পিউটার ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের কল্পনা করা যায় না। কম্পিউটার জায়গা করে নিল সর্বত্র। আর কম্পিউটার সাইন্স হয়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কম্পিউটার হয়ে উঠলো মানুষের নিত্য সঙ্গী। ছাপাখানা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রসংগীত, ছবি আঁকা সর্বত্র এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো কম্পিউটারের আশীর্বাদে। ডানা বিহীন পাখি যেমন আকাশে উড়তে পারে না তেমনি আধুনিক বিশ্বে মানুষ কম্পিউটার ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। তাই এ যুগের নাম হয়ে গেল কম্পিউটারের যুগ।

বিজ্ঞানের যুগ ও কম্পিউটারের যুগ অতিক্রম করে বর্তমান বিশ্ব যে যুগে এসে পৌঁছেছে তার নাম আমরা সবাই জানি। তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান সময়কে আইসিটির যুগ বলা হয়। এ বিশ্ব সভ্যতা আইসিটি নির্ভর। বর্তমান বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সফলতা পুরোপুরি আইসিটির হাতে। আইসিটি ব্যবহার করে যত সহজে মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যায়, মানুষের মন জয় করা যায় অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। ব্যবসায়িক প্রচার, প্রসার, বাজারনিয়ন্ত্রণ আইসিটি বা তথ্য ও

* *সহকারী শিক্ষক, উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা।*

যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তথ্য ও জলছবি প্রযুক্তি সারা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের এক উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। বর্তমানে এক মুহূর্তে একজন মানুষের কথা তার আদর্শ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেউ হয়ে যাচ্ছে হিরো আবার কেউ হয়ে যাচ্ছে জিরো। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বর্তমানে মানুষের দূরত্ব কমিয়েছে। সারা পৃথিবীকে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। মানুষকে আলোকিত করা, মানবিক করে তোলা, কুসংস্কারমুক্ত যুক্তি নির্ভর আধুনিক সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ভার আইসিটির ওপর ন্যস্ত।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক নিকট অতীত থেকে সুদূর অতীতের দিকে। যখন বিদ্যুৎ ছিল না বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা ছিল না আর আইসিটি সেতো কল্পনাতীত বিষয় ছিল। ফলে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রটি ছিল একেবারে সংকুচিত। একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কারো তেমন পরিচয় ছিল না। যোগাযোগ ছিল না। ভাষাগত কারণ, ভৌগোলিক কারণ নৃতাত্ত্বিক কারণ, সাংস্কৃতিক কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তে মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের কাছে ছিল সম্পূর্ণরূপে অজানা অচেনা। তাই পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বিস্তৃত করা এবং শাসন কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ আকণ্ঠ অজ্ঞতা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ভুল ভ্রান্তি ও মিথ্যা তথ্যের ছড়াছড়ি ছিল চারিদিকে। সমাজ ছিল অস্থিরতায় ভরপুর। মানুষ ছিল দিশেহারা। কুসংস্কার ও পিতৃ পুরুষের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অন্ধবিশ্বাস সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টের মূল কারণ ছিল। মূর্তি পূজা, অগ্নি পূজা আরো নানাবিধ আরাধনার মাধ্যমে বহু স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার মিথ্যা প্রতিযোগিতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ঠিক সেই সময়ে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরব মরুভূমিতে আভির্ভূত হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তা বাহক। দিকভ্রান্ত মানবজাতির কাছে নিয়ে এলেন মহামূল্যবান সত্য তথ্য। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা একক ও অদ্বিতীয়। তিনি এমন এক সত্তা যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। জগতের যা কিছু আছে সমস্তই তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। যাবতীয় আরাধনা এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এটি পরম সত্য তথ্য। চিরন্তন ও শাশ্বত এ বার্তা যিনি নিয়ে এলেন তিনি মরুর দুলাল মুহাম্মদ (ﷺ)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মেসেঞ্জার। শান্তি ও কল্যাণের সুসংবাদদাতা একই সাথে ভয়াবহ কঠিন শাস্তির সতর্ককারী।

পবিত্র কুরআনুল কারিমের বিস্ময়কর তথ্য বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানুষের চিন্তাকে আলোকিত করে এবং কোনো অনুসন্ধিৎসু মানুষকে তাড়িত করে। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি প্রত্যেকটি প্রাণীরই ভাষা আছে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দা সোলায়মান (আলাইহিস সালাম)-কে সকল প্রাণীর ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পিপীলিকা ও হুদহুদ পাখির সাথে তার কথোপকথনের চাঞ্চল্যকর বিষয়টি কুরআনুল কারীমে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল বিষয়ে সম্যক অভিহিত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করেন। সোলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিলেন। শুধু পিপীলিকা ও হুদহুদ পাখি নয় বিশাল প্রাণীকুলের ওপর তার কর্তৃত্ব ছিল। এমনকি জিন্‌রা তার অনুগত ছিল। বাতাসকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সোলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন।

সূর্যের পূজারী, বিশাল সিংহাসনের অধিকারী রানী বিলকিসকে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বার্তা প্রেরণ করেন সোলায়মান (আলাইহিস সালাম)। তারপর তার সিংহাসন চোখের পলকে নিয়ে আসেন। এক পর্যায়ে রানী বিলকিসকে সোলায়মান (আলাইহিস সালাম) তার অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত স্বচ্ছ পানি সাদৃশ্য প্রাসাদে তুলে নিয়ে আসেন। এমন বিস্ময়কর ঘটনার তথ্যসূত্র পবিত্র কুরআনুল কারীম। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার

করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বেচ্ছাচারী, মানুষের অধিকার হরণকারী, মানবতা বিরোধী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম কর্তৃক ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে স্বস্ত্রীক অপহরণ করার বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার সম্পূর্ণ অপব্যবহার। বিশ্বব্যাপী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পাশাপাশি আধিপত্য বিস্তারে এমন নেক্কারজনক ঘটনার মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার অপচেষ্টা মানুষের মনে শুধু ঘৃণাই বাড়াচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীর চারিদিকে বাজছে যুদ্ধের দামামা। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাঈলের আক্রমণ ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের হৃদয়কে করেছে ক্ষতবিক্ষত। অতি সম্প্রতি আমেরিকা ও ইসরাঈলের যৌথ অভিযানে ইরানের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। নিহত হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যুদ্ধবাজ ট্রাম্প আর নিষ্ঠুর নেতানিয়াহুর হাত থেকে রেহাই পায়নি ইরানের নিষ্পাপ শিশু শিক্ষার্থীরা। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য আকাশ হতে নিক্ষেপ করছে জীবন বিধ্বংসী মিসাইল। ডাল তলোয়ার, অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্যের পরিবর্তে আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধ দেখে মানুষ বিস্মিত হচ্ছে। এর চেয়েও বিস্ময়কর তথ্য কুরআনুল কারিমের সূরাতুল ফিলে রয়েছে। আব্রাহার হস্তি বাহিনীর ওপর আবাবিল পাখির কংকর নিক্ষেপ এবং তাদেরকে নাস্তানাবুদ করার বর্ণনার সাথে বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঈগল পাখি সদৃশ যুদ্ধবিমান থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরক নিক্ষেপের ঘটনা কুরআনুল কারীমের তথ্যের কাল উত্তীর্ণ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত ঔষধ মহা জটিল রোগ থেকে মানুষকে মুক্তি দিচ্ছে। এ কথা সত্য কিন্তু এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন ঈমানদাররা। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র যখন ব্যর্থ, মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন অচল, মানুষ যখন চেতনা হারিয়ে ফেলে তখন কৃত্রিমভাবে মানুষের অর্গানগুলো সচল রেখে দিনের পর দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এমন নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে মৃতপ্রায় মানুষ যখন কয়েক মাস পরে কিংবা বছরখানেক পরে জীবিত হয়ে ওঠে তখন তাকে নিয়ে চিকিৎসা জগতে হৈ চৈ পড়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমন সাফল্য বিশ্ব মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে স্থান পায়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামের সূরা কাহাফে এর চেয়েও বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশন করেছেন। বলা হয়েছে গুহাবাসীরা গুহার মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েক শত বছর ছিল অতঃপর আল্লাহর কৃপায় তারা আবার জেগে উঠল। মানুষকে দিনের পর দিন ঘুমন্ত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জাগ্রত করার এমন তথ্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেয়েও বিস্ময়কর নয় কি? পরিশেষে বলা যায় বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ইতিহাস, যুদ্ধ কৌশল, মানব সৃষ্টির রহস্যসহ সকল বিষয়ের সর্বাধুনিক তথ্যের এক মহা মূল্যবান গ্রন্থের নাম আল কুরআনুল কারীম।

আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের প্রতিদান জান্নাত

(এক) আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো 'আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। যখন ঐ ব্যক্তিটি প্রত্যাবর্তন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে যা করতে বলা হয়েছে, যদি সে তার ওপর 'আমল করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩।*

(দুই) জুবায়র ইবনু মুত্'ইম (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন; আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৬।*

তাওহীদী চেতনার গুরুত্ব

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাওহীদ এমন এক আলো, যা একদিকে মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, অপরদিকে সমাজকে ন্যায়-নীতি ও স্থিতিশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম আহ্বানই তাওহীদের দিকে, আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শেষ নসীহতও ছিল তাওহীদের প্রতি অটল থাকা। সমস্ত নবীদের দা'ওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তি এবং একজন মু'মিনের ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি –সবই এই একক সত্যে এসে মিলিত হয়। আজকের আধুনিক সমাজ এমন এক সময় অতিক্রম করছে যখন প্রযুক্তিগত উন্নতি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছালেও মানুষের হৃদয় শূন্য, বিবেক অবক্ষয়িত, পরিবার ভঙ্গুর, নৈতিকতা ক্ষয়িষ্ণু, মানসিক অস্থিরতা ভয়াবহ এবং জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা ব্যাপক। এ সংকটের মূলে রয়েছে তাওহীদী চেতনার বিচ্যুতি। তাওহীদ মানুষের হৃদয়ে এমন ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করে, যা তাকে সৎকর্মে দৃঢ় রাখে, অন্যায়ের মুখোমুখি হতে সাহস দেয় এবং জীবনে মহান আল্লাহকে কেন্দ্র করে একটি স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করে। একটি ব্যক্তি যখন তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরিবারে শান্তি আসে; পরিবারে শান্তি এলে সমাজে স্থিতি আসে; আর সমাজে স্থিতি এলে সভ্যতা উন্নত হয়। তাই তাওহীদ শুধু ধর্মীয় অনুভূতি নয় এটি ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এই কারণে তাওহীদী চেতনার পুনর্জাগরণ আজকের সমাজে একটি ধর্মীয় প্রয়োজনই নয়; বরং একটি মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক আবশ্যকতা। নিচে আধুনিক সমাজে তাওহীদী চেতনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো–

১. তাওহীদ-ইসলামের অগ্রণী বীজ ও চিরন্তন ভিত্তি: "তাওহীদ" অর্থ একত্ববাদের এমন এক গূঢ় বাণী, যা ইসলামের হৃৎস্পন্দন; যেখানে মহান আল্লাহর একাত্মতা, তাঁর গুণাবলী এবং 'ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্বাসই ইসলামের সব স্তম্ভ ও নির্দেশনাকে এক অনন্য অভিমুখে পরিচালিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।"[১]

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র, অপরূপ, অনন্য। তাঁর সমকক্ষ নেই, নেই তাঁর সমতুল্য, এ সত্যই তাওহীদ-এর মর্ম।

২. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাওহীদের চেতনা: তাওহীদ শুধুমাত্র 'আক্বীদার ভিত্তি নয়, এটি সামাজিক ন্যায়, মানবসমতা ও নৈতিক দায়িত্ববোধেরও মূল উৎস। আল্লাহর একত্বের ঘোষণা মানুষকে শেখায় যে, সকল সৃষ্টিই এক মহান স্রষ্টার বান্দা কেউ কারো ওপর জাতি, বর্ণ, শ্রেণি বা সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। এই ঈমান যখন হৃদয়ে প্রোথিত হয়, তখন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই একটি ঈমানী দায়িত্বে পরিণত হয়। আল্লাহ ঘোষণা করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"হে মানুষসকল! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদেরকে গোত্রে গোত্রে বিভাজন করেছি পরিচিতির জন্য; তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক সম্মানিত যে অধিক পরহেজগার।"[২]

এই আয়াত মানবজাতিকে একই উৎসে ঐক্যবদ্ধ করে; সুতরাং তাওহীদ মানুষকে সব ধরনের বর্ণবাদ, শ্রেণি বৈষম্য, গোত্রীয় অহংকার থেকে মুক্ত করে।

তাওহীদ দুর্বল ও নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায় এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব

---

* *মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[১] *সূরা আল- ইখলা-স : ১।*

[২] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৩।*

হলো তাঁর দেওয়া অধিকারগুলো সবার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা মানে মহান আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উপকার করার আদেশ দেন।"[১]

এ আয়াতের নির্দেশ তাওহীদের সরাসরি ফল। কারণ, যখন মানুষ বুঝে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর তখন সে আর কারো সাথে অবিচার করতে সাহস পায় না। জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

"হে মানুষসকল! জেনে রাখো, তোমাদের রব একজন, তোমাদের পিতা একজন। আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবের ওপর আরবের নেই; শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের নেই, কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের নেই, শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে।"[২]

৩. মানুষকে ভয়ের বদলে সাহস ও স্বাধীনতা দেয়: তাওহীদের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রভাব হলো, এটি মানুষের হৃদয়কে সকল অশুভ ভয়, কুসংস্কার, শির্ক ও মানবভীতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেয়। যে মানুষ উপলব্ধি করে যে ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, সে আর সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না। মানুষের ভয় তাকে বন্দি করে, কিন্তু তাওহীদের আলো তাকে স্বাধীনতার স্বাদ দেয়। এক মহান আল্লাহর ভয়, সকল ভয় থেকে মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

"মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।"[৩]

এই আয়াত মানুষের অন্তরকে মুক্ত করে দেয়। কারণ যে মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে আর কোনো মানব, ক্ষমতা, প্রভাব বা কুসংস্কারের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে না। তাওহীদ মানুষকে মুক্ত করে শির্ক, কুসংস্কার ও মানবনির্ভরতার অন্ধকার থেকে। যখন মানুষ জানে যে, ভাগ্য নির্ধারণকারী কেবল আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি-সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই শির্ক, ভণ্ড পীর, তাবিজ-কবচ, কুসংস্কার, ভবিষ্যদ্বক্তা –এসব ভ্রান্ত নির্ভরতা থেকে দূরে থাকে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"যে তাবিজ ঝুলায়, সে শির্কে লিপ্ত হয়।"[৪]

তাওহীদ থেকে যে তিনটি সাহসের ফল জন্মায়-শির্ক, কুসংস্কার, ভণ্ড পীর ও তাবিজ-কবচ থেকে মুক্তি। সত্য কথা বলার সাহস জন্মায় কারণ সে কারো রোষের ভয়ে মিথ্যে বলে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি দেয় 'ক্ষমতা' নয়, মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারের ওপর বিশ্বাস তাকে দৃঢ় করে। তাওহীদ সত্য উচ্চারণের সাহস দেয়, মহান আল্লাহর ভয় মানুষকে সত্য বলার শক্তি দেয়। আর মিথ্যার সাথে আপস করতে দেয় না। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"[৫]

তাওহীদ মানুষকে শুধু মহান আল্লাহর বান্দা বানিয়ে অন্য সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

বড় সাহাবিদের শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও ন্যায়বোধের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল এই "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ" যে শব্দ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মহান আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনে।

---

[১] *সূরা আন্-নাহল : ৯০।*

[২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৩৯১; জামে' আত্ তিরমিযী (তাফসীরুল কুরআন)- হা. ৩২৭০; আদ্ দারেমী (মুকাদ্দিমাহ)- হা. ২৬০; আল-বায়হাক্বী (শু'আবুল ঈমান)- হা. ৪৭৬১।*

[৩] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪।*

[৪] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৩৫৯১; আবূ দাউদ- হা. ৩৮৮৩; মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ৩৩৮৬; হাকিম বলেন : সনদ সহীহ।*

[৫] *সুনান আন-নাসায়ী- হা. ৪২০৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০১১; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১১২২৪, ১১৪৬৭, ১৫০৭।*

৪. অর্থনীতি ও ব্যবসায় নৈতিকতা আনে: তাওহীদ শুধু ‘ইবাদতের বিষয় নয়, এটি সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির বিশ্বাস রাখে, সে আর কারো সম্পদ গ্রাস করতে পারে না, কারো সাথে প্রতারণা করতে পারে না, কোনো অন্যায়ের লেনদেনে যুক্ত হতে পারে না। তাওহীদ মানুষের ভেতর জন্ম দেয়, হালাল-হারামের বোধ, ন্যায্যতার নীতি, সততার দৃঢ়তা এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। কুরআনের ভাষ্যমতে, সুদ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।”[১]

বক্ষমান আয়াতটি প্রমাণ করে যে, তাওহীদী অর্থনীতির মূলনীতি হলো হালাল উপার্জন, সুচিত আচরণ এবং সুদের মতো যুল্‌ম থেকে দূরে থাকা। সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

“হে মু‘মিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।”[২]

এটি প্রতারণা, ঘুষ, যুল্‌ম, ঠকবাজি, মাপ-তোলায় কারচুপি –সবকিছুকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাদীসের ভাষ্যমতে, ব্যবসায় সততার প্রশংসা রয়েছে।

তাওহীদ অর্থবিত্তের জগতে এক আলোকবর্তিকা যা মানুষকে শেখায়, অর্থ নয়, মালিক হলেন আল্লাহ; সম্পদ নয়, আসল আমানত হলো দায়িত্ব; ব্যবসা নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো হালাল উপার্জন তাওহীদী চেতনা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সম্পদ অন্যায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যার মাঝে সুদ, যুল্‌ম বা প্রতারণা মিশে থাকে তা কখনো বরকতময় হতে পারে না। এই বিশ্বাসের কারণেই, মানুষ হালাল-হারামের বোধে জাগ্রত হয়, ব্যবসায় সততা ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার গড়ে ওঠে।

৫. পরিবার ও সম্পর্কের দৃঢ়তা: তাওহীদ কেবল মহান আল্লাহর প্রতি একত্বের বিশ্বাস নয়; এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককেও আলোকিত করে।

যখন মানুষ উপলব্ধি করে– প্রতিটি দায়িত্ব মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহির বিষয় তখন সে নিজের পরিবার এবং সমাজে ন্যায়, সম্মান ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে। পরিবার হলো সমাজের প্রথম ন্যায়বিচারের একক। পরিবারে দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সম্মান এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ না থাকলে সমাজও দুর্বল হয়। তাওহীদ এই সম্পর্কগুলোকে শক্তিশালী করার প্রধান শক্তি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

“তোমাদের রব আদেশ দিয়েছেন –শুধু তাঁর ‘‘ইবাদত করবে এবং মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করবে।”[৩]

বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও সম্মান নিশ্চিত করা, ন্যায় ও পারস্পরিক ভালোবাসা তাওহীদের অংশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

“আর আল্লাহর ‘ইবাদত করো এবং তাঁকে কোনো কিছুর সঙ্গে শরিক করো না। বাবা-মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করো, আত্মীয়দের, অনাথদের, দরিদ্রদের, কাছের প্রতিবেশীদের, দূরের প্রতিবেশীদের, সহযাত্রীদের এবং পথিকদের সঙ্গে এবং তোমাদের অধীনস্থদাস-কর্মচারীদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবহেলাকারী এবং অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”[৪]

তাওহীদ মানুষকে শেখায়, শুধু পরিবারের সদস্য নয়, সকল সম্পর্কের প্রতি দায়িত্বশীল হতে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[২] *সূরা আন্-নিসা : ২৯।*
[৩] *সূরা আল-ইস্‌রা : ২৩।*
[৪] *সূরা আন্-নিসা : ৩৬।*

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

"যে নিজের পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে, সে বান্দাদের মধ্যে সেরা। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারে সেরা।"[১]

এটি দেখায় যে, পরিবারে দায়িত্ববোধ, সম্মান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা তাওহীদী চেতনার অপরিহার্য অংশ। তাওহীদ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, এটি বাস্তব জীবনে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।

পরিবারের প্রতিটি দায়িত্ব পালন, বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান, সন্তানদের সঠিক শিক্ষা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা এগুলো সমাজকে দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ করে।

যেমন- একটি অটল ভবনের ভিত্তি যত শক্ত, পুরো ভবন তত দৃঢ় থাকে, পরিবার শক্ত হলে, সমাজও শক্ত হয়।

তাওহীদ মানুষকে শিখায়, সম্পর্কের ভিত্তি, দায়িত্ব, সম্মান, ভালোবাসা ও ন্যায়, আর এই ভিত্তিতেই গড়ে উঠে স্থায়ী ও সুস্থ সমাজ।

৬. বিশ্বায়নের যুগে পরিচয়ের সুরক্ষা: আজকের বিশ্বায়নের যুগে, মানুষের মনোভাব, জীবনধারা এবং সংস্কৃতি এক দিকে যেমন বৈচিত্র্যময়, অন্য দিকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো। এই ঢেউ মানুষের আত্মপরিচয়কে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং মানসিক দিক থেকে শিথিলতা আনে। তাওহীদ এই পরিস্থিতিতে স্থির, দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী পরিচয় প্রদান করে। একজন মানুষ যখন মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেকে সনাক্ত করে, তখন সে বুঝতে পারে– আমি মহান আল্লাহর বান্দা তার জীবন পরিচালনার মানদণ্ড সরাসরি ওহী ও শারীয়তের নিয়মে। সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশ ও কুরআনের আলোকে। ফলে, ব্যক্তি পরিচয় সংকটে পড়ে না। সে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে বিশ্ব সমাজের অংশ হতে পারে, বিভ্রান্তি বা প্রভাবিত হবার ভয় ছাড়াই। এর কিছু নিম্নরূপ তুলে ধরা হলো–

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩৬৫; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৮২৭৯।*

ক) মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন্ ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমারই 'ইবাদত করার জন্য।"[২]

এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমাদের মূল পরিচয় মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে। আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত।

২. সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি হলো ওহী: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"আর যে কেউ সৎকর্ম করে–পুরুষ হোক বা নারী– অবস্থায় সে মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর বিন্দু পরিমান যুল্‌ম করা হবে না।"[৩]

বৈশ্বিক বিভ্রান্তি ও ভিন্ন মতবাদের মাঝে মহান আল্লাহর ওহীই হলো নির্ভুল সত্যের মানদণ্ড।

৩. আত্মমর্যাদা ও স্থির পরিচয়: জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

"মানুষের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী।"[৪]

তাওহীদী চেতনা ব্যক্তি ও সমাজকে শক্তিশালী করে, আত্মমর্যাদা অটল রাখে এবং বৈশ্বিক প্রভাবের সামনে চিরস্থায়ী পরিচয় নিশ্চিত করে। বিশ্বায়নের যুগে পরিচয়ের সুরক্ষা কেবল সামাজিক বা নৈতিক প্রয়োজন নয়, এটি আত্মিক শক্তি ও স্থিরতার প্রতীক। কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশনায় লিপ্ত থাকলে, ব্যক্তি বিভ্রান্তির স্রোতেও নিজের পরিচয় অটল রাখতে সক্ষম হয়।

[২] *সূরা আল-যা-রিয়া-ত : ৫৬।*
[৩] *সূরা আন্-নিসা : ১২৪।*
[৪] *আল-মু'জামুল আওসাত- আত-তাবারানি, হা. ৫৭৮৭; শাইখ আলবানী একে হাসান বলেছেন; সাহীহাহ্- হা. ৮৯৫।*

أفكار ذات صلة / প্রাসঙ্গিক ভাবনা:

ইসলামের আলোকে শ্রমিকের অধিকার

জান্নাতুল মহল*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। শুধু পরিপূর্ণই নয়। সুন্দর, সাফল্যময় জীবন ব্যবস্থা। যা দেখে বা যা জেনে মুগ্ধ হওয়ার কথা। সেখানে কোনো ভুলের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা কোথায়? অজ্ঞতা, মূর্খতার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসার এখনও কি সময় হয়নি? সারা বিশ্ব যেখানে হাতের মুঠোয়। হাতের মুঠোয় ব্যবহার হয়-ফেসবুক, নেটওয়ার্ক। সারা বিশ্ব জ্ঞানের আলোয় ঝলমল করে নেটওয়ার্কে। দুঃখ হয় শুধুমাত্র নিজের ধর্ম বা দীনের ব্যাপারে আমরা জাহেলী (অজ্ঞতা) যুগেই অবস্থান করছি।

শ্রমিক কে?

পৃথিবীতে কোনো মানুষ তার সকল কাজ একা আঞ্জাম দিতে পারে না, বিশেষতঃ এই জটিল শিল্পায়নের যুগে জীবন ধারনের জন্য সব মানুষকেই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বিভিন্ন স্তরে এক জনের অধীনে এক বা একাধিক জন কাজকামের আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

কোনো ব্যক্তির অধীনে মজুরীর বিনিময়ে যে শ্রম দেয় সে-ই শ্রমিক। এক কথায় অধীনস্তদের শ্রমিক বলা হয়। এই শ্রমিক একজন উর্ধতন কর্মকর্তা থেকে একেবারে নিচের দিকের ফ্যাক্টরী, দোকান বা অফিসের যে কোনো কর্মচারী, গাড়ীর চালক, বাড়ীর দাস-দাসী। মজুরীর বিনিময়ে যে কারো অধীনে কাজ করে-এই অধীনস্তদেরকেই শ্রমিক বলা হয়।

মানব জাতির অস্তিত্ব, প্রগতি, সভ্যতা, উন্নয়ন-সব কিছুর মূলে রয়েছে শ্রমিকের অবদান। এই শ্রমিকরাই পৃথিবীতে অতীতকালে হয়েছে যেমন- নির্যাতীত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত। আধুনিক সভ্যতা ও শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জোর দাবীর এ যুগেও সর্বত্র দৃশ্যমান শ্রমিকের অবর্ণনীয় দূর্দশা ও করুন জীবন-যাপনের চিত্র। অথচ ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে শ্রমিকের সকল সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম প্রত্যেক শ্রেনীর শ্রমিকের জন্য মৌলিক কিছু অধিকার প্রদান করেছে।

ন্যায় সঙ্গত মজুরী পাবার অধিকার

শ্রমিককে ন্যয় সঙ্গত ও সম্মানজনক পারিশ্রমিক বা বেতন-ভাতা প্রদান করা ইসলামের এক অন্যতম নির্দেশ। এ বেতন-ভাতার পরিমান অন্ততঃ এতটুকু হতে হবে যা তার নিজের ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরনে সক্ষম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।"[১]

বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার

শারিরীক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ, সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিককে বিশ্রাম বা রেস্ট নেয়ার অধিকার প্রদান করেছে ইসলাম।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "তোমরা তাদের (শ্রমিকদের) ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দিও না যা তারা বহন করতে সক্ষম নয়।"[২]

অতএব, শ্রমিকের শারীরিক-মানষিক সুস্থতা ও পরিবারের হক্ব বা অধিকার আদায় করার জন্য দৈনন্দিন বিশ্রাম ও বিশেষ ছুটি পাবার অধিকার রয়েছে।

নিরাপত্তা লাভের অধিকার

ইসলাম শ্রমিকের ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রতিও নির্দেশ প্রদান করেছে। একজন শ্রমিক অসুস্থ, আহত বা কর্মে অক্ষম হলে ঐ শ্রমিকের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য "শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড" বা বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে সহায়তা প্রদান করার বিধান করেছে ইসলাম। অনুরূপ একজন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার বিধানও নিশ্চিত করার প্রতি ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সহায়-সম্পত্তি রেখে মারা গেলো তা তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্ঠিত হবে। আর যে ব্যক্তি অসহায়-সন্তান-সন্ততি রেখে মারা গেলো আমিই তার

---

* *হজ্জ ট্রেইনার, বাংলাদেশ হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *সূরা হূদ: ৮৫।*

[২] *মুসান্নাফে 'আব্দুর রায্যাক।*

অভিভাবক। অর্থাৎ- সরকার প্রধান ইসলামী বিধান অনুযায়ী পিতৃহীন অসহায় সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করবে।

বৃদ্ধ ও অসুস্থতার জন্য ভাতালাভ শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলাম এই অধিকারের কথাও স্বীকার করে। কেননা, শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হলো শ্রম। কিন্তু সে বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পরলে তার বেঁচে থাকার আর কোনো পুঁজিই থাকে না, যা দিয়ে সে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। তাই বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অসহায়, বিধবা, দূর্বল লোকদের ভরণ-পোষন এর দায়িত্ব মালিকের যে মালিকের অধীনে সে কাজ করেছে আর সরকারের।

সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অন্য সব সুবিধাদি পাবার অধিকার

ইসলামী শ্রমনীতিতে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে শ্রমের ধরণ, শ্রমদানের সময়, ঝুঁকি, বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট চুক্তি থাকতে হবে। এ চুক্তি অনুযায়ী একজন শ্রমিক তার মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমদান করবে। যে পক্ষ চুক্তির বরখেলাপ করবে, তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا﴾

“আর ওয়াদা পূর্ণ করো, ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”[১]

শ্রমিকের প্রতি দয়াশীল হওয়া ও তার অধিকারকে কোনোভাবেই খর্ব না করা। অর্থাৎ- ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক-শ্রমিক সবারই দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

«هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ».

“তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ তা‘আলা যার ভাইকে তার অধিনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো, যা সে নিজে খায় এবং তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যের বাইরে। যদি কখনো তার ওপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে।”[২]

[১] *সূরা ইস্‌রা: ৩৪।*
[২] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

﴿قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ﴾

“(নবী মূসা [আলাইহিস সালাম] বলল–) আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি রইল, আমি দু'টি মেয়াদের যেটিই পূর্ণ করি না কেন, আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হবে না, আমরা যে কথা বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী।”[৩]

শুয়াইব (আলাইহিস সালাম) যখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে কর্মে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি তাকে পরিস্কারভাবে আশ্বস্থ করে বলেন, ‘আমি চাইবো না যে তোমার কষ্ট হোক’।[৪]

মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য?

মালিকের প্রধান কর্তব্য হলো– কর্মক্ষম, সুদক্ষ, শক্তিমান, আমানতদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। কর্মক্ষম ও আমানতদারী এই দুই গুণ ব্যতীত কোনো কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে,

﴿اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ﴾

“আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।”[৫]

মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী নির্ধারণ করে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয়।

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيْرِ حَتَّى.

“মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।”

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের প্রধান দায়িত্ব। রাসূল (ﷺ) শ্রমিকের মজুরি সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।”[৬]

[৩] *সূরা আল-ক্বাসাস: ২৮।*
[৪] *সূরা আল-ক্বাসাস: ২৮।*
[৫] *সূরা আল-ক্বাসাস: ২৬।*
[৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৪৪৩।*

শ্রমিক, কর্মচারী, দিনমজুর যে-ই হোক না কেন তার থেকে শ্রম আদায়ের পর যথারীতি তার পাওনা পরিশোধ না করা মহা যুল্‌ম।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেনীর মানুষের বিরুদ্ধে বাদী হব।

১. যে ব্যক্তি আমার অনুগত হওয়ার পর বিশ্বাষঘাতকতা করে।

২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন বা মুক্ত লোককে ধরে বিক্রি করে।

৩. যে ব্যক্তি কোনো মজুরকে নিয়োগের পর তার থেকে পুরো কাজ আদায় করেও তার পাওনা পরিশোধ করে না।[১]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সকল দায়িত্বশীল ও উর্ধতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন প্রত্যকেই নিজ নিজ অধিনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের ওপর কোনো প্রকার যুল্‌ম অত্যাচার না করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ﴾

"এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়া-তীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।"[২]

প্রত্যেকের দায়িত্ব– মহান আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করা।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকে তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসীত হবে।"[৩]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অধিনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে।[৪]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "হে আল্লাহ! কোনো ব্যক্তি যদি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয়, আবার সে অধিনস্তদের প্রতি কঠোরতা করে তুমি তার ওপর কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয়ে তাদের ওপর নরম হয় তুমি তার ওপর নরম হও।[৫]

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের অধিনস্তদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হব। দাস তার মনিবের সম্পর্কে দায়িত্বশীল। এ কাজের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[৬]

ইসলামে মালিকদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের ওপরও বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের ওপর একজন মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এরপর সে এ কাজ শুধু পেটের জন্য করে না; বরং করবে আখিরাতের আশায়। কেননা চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾

"মাপ দেয়ার সময় মাপ পূর্ণমাত্রায় করবে, আর ওজন করবে ত্রুটিহীন দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম নীতি আর পরিণামেও তা উৎকৃষ্ট।"[৭]

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۞ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ﴾

"দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়), যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরামাত্রায় নেয়, আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[৮]

মুফাস্‌সিরগণের মতে এ আয়াতের মধ্যে মাপে কম-বেশি করার ভাবার্থে ঐসব মজুরও শামিল যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরি উসুল (গ্রহণ) করে অথচ কাজেও গাফিলতি প্রদর্শন করে।

শ্রমিকের দায়িত্ব হচ্ছে চুক্তি মোতাবেক দেওয়া কর্ম অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করা।

---

[১] *ফাতহুল বারী- ইমাম বুখারী, ৪/৪৪৭ পৃ.।*
[২] *সূরা আন্-নিসা: ৩৬।*
[৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৪] *সহীহ মুসলিম।*
[৫] *সহীহ মুসলিম।*
[৬] *বুখারী- হা. ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪; মুসলিম- হা. ১৮২৯।*
[৭] *সূরা ইস্‌রা-ঈল: ৩৫।*
[৮] *সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন: ১-৩।*

হাক্কুল ইবাদ আদায়ে জান্নাত

হাক্কুল ইবাদ অর্থ- সৃষ্টি জগতের অধিকার বা বান্দার হাক্ক। এই অধিকার আদায়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

“হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু’জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক্ব) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।”[১]

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

“তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করো, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়া-তীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালোবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।”[২]

আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর নির্দেশ: প্রথম নির্দেশ মহান আল্লাহর হক্ব– মহান আল্লাহকে ভয় করো, মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। আরো নির্দেশ– বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন, ইয়া-তীম, প্রতিবেশী, আয়ত্বাধীন দাস-দাসীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ, তাই মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনই ‘ইবাদত। আর এই নির্দেশ দায়িত্ব পালনের, যা ‘হাক্কুল ইবাদ’ যা আদায়ে জান্নাত।

[১] *সূরা আন্-নিসা: ১।*
[২] *সূরা আন্-নিসা: ৩৬।*

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের অধীনস্ত সম্পর্কে প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করা হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব, সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। দাস তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। এ কাজের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, অতএব, প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর কিতাবে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন– প্রত্যেক কাজে মহান আল্লাহকে ভয় করো– ‘ওয়াত্তাকুল্লাহ’ (আর মহান আল্লাহকে ভয় করো)। “হাক্কুল ইবাদ” আদায়ে মহান আল্লাহকে ভয় করতেই হবে। মহান আল্লাহকে ভয় ব্যতীত এই দায়িত্ব পালন কখনো সম্ভব নয়। অতএব, এই দায়িত্ব পালনের শীর্ষে থাকবে মহান আল্লাহর ভয়। তবেই তা ‘ইবাদত হিসাবে গন্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ﴾

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী। আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।”[৪]

﴿وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ﴾

“যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছবে, জান্নাতের দরজাগুলো (পূর্ব থেকেই) উন্মুক্ত (দেখতে পাবে)। জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা বলবে– তোমাদের ওপর শান্তি (বর্ষিত হোক), চমৎকার কাজ করেছ তোমরা, কাজেই চিরকালের জন্য এতে প্রবেশ করো।”[৫]

[৩] *বুখারী- হা. ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪; মুসলিম- হা. ১৮২৯; আত্ তিরমিযী- হা. ১৭০৫; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৯২৮।*
[৪] *সূরা ফা-ত্বির: ২৮।*
[৫] *সূরা আয্-যুমার-৭৩।*

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র

মোঃ কায়ছার আলী*

সংবিধান বা শাসনতন্ত্র সরকারের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেয়। এটা হলো যে কোনো রাষ্ট্রের মূল ও সর্বোচ্চ আইন। যার মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা চর্চার শাখাগুলোকে বিধিমালার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।*

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র হলো মদিনা সনদ। যা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়। ইতোঃপূর্বে আইন ছিল স্বৈরাচারী শাসকের ঘোষিত আদেশ এবং সরকার ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রীভুত। সর্বপ্রথম মহানবী (ﷺ) জনগণের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন বা মদীনা সনদ (ম্যাগনাকার্টা) প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরতের পর মহানবী (ﷺ)-এর কর্তব্য ছিল কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত মদিনাবাসীদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বসংঘ গঠন করে হিংসা, দ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে উচ্ছেদ করা বা গোত্রে গোত্রে চিরদ্বন্দ্ব দূর করা। এক গোত্র আরেক গোত্রকে সমর্থন করায় মদিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল ও শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং সংশয়, উদ্বেগ ও অস্থিরতার মধ্যে কালতিপাত করতে থাকে। মহানবী (ﷺ) মদীনায় আগমন করলে মদীনাবাসীগণ তাঁকে সাদরে ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। মহানবী (ﷺ) ছিলেন নবজাগরণের অগ্রনায়ক, ভবিষ্যত কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠাতা, মিলনের দূত, আশার আলো ও বিশ্বমানবের ত্রানকর্তা বিশেষ করে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলবার জন্য সাতচল্লিশটি শর্ত সম্বলিত এই মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন। "মহান ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে রাসূল করিম (ﷺ) কর্তৃক লিখিত ও প্রদত্ত চুক্তিপত্র (সনদ) কুরাইশ ও ইয়াসরিবের (মদিনাবাসী) বিশ্বাসী ও মুসলমানদের জন্য এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে (মাওয়ালী) এবং যারা তাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে (জিহাদ) অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য প্রদত্ত হলো–

(১) তারা (সনদে উল্লেখিত) একটি জাতি (উম্মা) এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র।

(২) কুরাইশ-মুহাজিরিন পূর্ব প্রচলিত প্রথানুযায়ী সমবেতভাবে খুন খেসারত প্রদান করেব এবং পরস্পরের সমঝোতর ভিত্তিতে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিচারের দ্বারা তাদের বন্দীদের মুক্তি দিবে।

(৩) বানু আউফ গোত্র তাদের পূর্বের শর্তানুযায়ী মৃত্যুপণ প্রদান করবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ গোত্র স্ব স্ব বন্দীর মুক্তিপণ প্রদান করবে।

(৪-১০) অনুরূপভাবে বানু হারিস, বানু সায়ীদা, বানু জুশাম, বানু নাজ্জার, বানু 'আম্র ইবনু আউফ, বানু নাফীত ও বানু আল-আউস গোত্র পূর্ববর্তী শর্তানুযায়ী মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণ প্রদান করবে।

(১১) বিশ্বাসীগণ কোনো ঋণী বন্ধুকে পরিত্যাগ করবে না; বরং মুক্তিপণ খুনের খেসারত ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাহায্য করবে।

(১২) একজন বিশ্বাসী অপর একজন বিশ্বাসীর অনুমতি ব্যাতীত তার মওলার সঙ্গে কোনো প্রকার সখ্যতা স্থাপন করতে পারবে না।

(১৩) মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত যদি কোনো বিশ্বাসী বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বা দূর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয় তবে তাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। কেউই অবিশ্বাসীর আপন পুত্রকেও এ ব্যাপারে ক্ষমা করতে পারবে না।

(১৪) একজন বিশ্বাসী কোনো পক্ষাবলম্বন করে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না অথবা কোনো বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীকে সাহায্য করতে পারবে না।

(১৫) আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা একক ও আশ্রয়দান (ইযাজুর) মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। বিশ্বাসীগণ পরস্পরের রক্ষক বা পোষণকারী, অন্যান্য লোক-গোষ্ঠির পোষনকারী নয়।

(১৬) মুসলমানদের অনুগামী কোনো ইহুদী যতদিন পর্যন্ত তাদের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করে অথবা তাদের বিরুদ্ধে অন্য লোকদের সাহায্য না করে তত দিন পর্যন্ত সে একই সাহায্য লাভ করবে।

(১৭) বিশ্বাসীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি চুক্তি (সনদ) একক এবং সামগ্রিক। যখন মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে তখন বিশ্বাসীগণ একত্রে যুদ্ধ করবে, তার জন্য পৃথক চুক্তির প্রয়োজন নেই। এই যুদ্ধের সময় কোনো বিশ্বাসী পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না।

(১৮) মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই পর্যায়ক্রমে (বিশেষ করে যাদের অশ্ব বা উট নেই) বিশ্বাসীদের অশ্ব বা উটে সওয়ার হতে পারবে।

(১৯) মহান আল্লাহর কাজে (ধর্মযুদ্ধে) যদি কোনো বিশ্বাসী প্রাণ দেয় তবে বিশ্বাসীগণ একত্রে এর প্রতিশোধ নিবে। খোদাভীরু বিশ্বাসীগণ সঠিক ও নির্ভুল পথে চলে।

(২০) কোনো বিশ্বাসী পৌত্তলিক কুরাইশকে আশ্রয় দিবে না এবং তাদের পক্ষ নিয়ে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করবে না।

---

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

(২১) কোনো বিশ্বাসীকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং হত্যার ঘটনা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ মৃত্যুপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাসীগণ কোনোক্রমে হত্যাকারীর পক্ষ সমর্থন করবে না।

(২২) এই সনদের প্রতি যারা সম্মতি জ্ঞাপন করছে এবং যারা মহান আল্লাহর ও শেষ দিনের বিচারে (আখিরাত) বিশ্বাস রাখে তারা কোনো দুস্কৃতিকারীকে আশ্রয় অথবা খাদ্য প্রদান করবে না। যদি কেহ তা লঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহ কর্তৃক সে অভিশপ্ত হবে। কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণে উক্ত অপরাধ মওকুফ হবে না।

(২৩) বিশ্বাসীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে তা আল্লাহ ও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সম্মুখে পেশ করতে হবে।

(২৪) বিশ্বাসীদের সঙ্গে ইহুদীগণও যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে।

(২৫) বানু আউফ ও সা'লাবাহ গোত্রের ইহুদীগণ এবং বিশ্বাসীগণ একই জাতি (উম্মা) ভুক্ত। বিশ্বাসীগণ ও ইহুদীগণ স্ব স্ব ধর্ম অনুসরণ করবে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত হবে না।

(২৬) বানু আউফের প্রতি যে শর্ত প্রদত্ত হয়েছে বানু নাজ্জার গোত্রের জন্যও অনুরূপ শর্ত প্রযোজ্য হবে।

(২৭-৩০) বানু হারিস, বানু সায়িদা, বানু জুশাম, বানু আউস ইহুদী গোষ্ঠীদের জন্য একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে।

(৩১) বানু আউফ গোত্রের জন্য যে শর্ত প্রযোজ্য বানু সা'লাবাহ গোত্রের জন্যই তাই প্রযোজ্য। শুধু ব্যতিক্রম এই যে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে তার পরিবারের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে।

(৩২) জাফনাহ নামক সালাবাহর উপগোত্রটি একইরূপ।

(৩৩) বানু আউফের ন্যায় বানু শুতায়বা গোত্রও বিশ্বাসঘাতক নয়, সম্মানজনক ব্যবহারের উপযুক্ত।

(৩৪) সা'লাবাহর মাওয়ালীগণও অনুরূপ।

(৩৫) ইহুদী সম্প্রদায়ের বিতানাও তাদের মতো। যারা রক্তের সম্পর্ক ব্যতীত ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের বিতানা বলা হয়।

(৩৬) মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুমতি ব্যতীত কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। কিন্তু কেউ আহত হলে তার প্রতিশোধ নিতে পারবে। কেউ হঠকারিতা করে কাউকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী ও তার পরিবার তার জন্য দায়ী থাকবে।

(৩৭) ইহুদীগণ ও মুসলমানগণ পৃথকভাবে নিজেদের খরচ বহন করবে। এই দুই দলের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ওপর সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশ্বাসঘাতকতার ওপর নয়।

(৩৮) এই সনদ যারা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা একত্রে শত্রুর মোকাবিলা করবে। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীগণও যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করবে।

(৩৯) এই সনদের আওতাভুক্ত লোকজনের নিকট ইয়াসরিব উপত্যাকা একটি পবিত্র স্থান।

(৪০) আশ্রিত প্রতিবেশী (জাব) কোনো প্রকার নাশকতামূলক অথবা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে লিপ্ত না হলে সে আপনজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪১) মহিলাগণ তাদের গোত্রের লোকদের সম্মতি ব্যতীত প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় (তুজার) পাবে না।

(৪২) এই সনদের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা বা বিবাদ উপস্থিত হয়, যার ফলে জাতির ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে বিচারের জন্য সেটার মহান আল্লাহর রাসূলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

(৪৩) কোনো কুরাইশ বা তাদের সাহায্যদাতাকে প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় দেয়া যাবে না।

(৪৪) ইয়াসরিব সহসা আক্রান্ত হলে এই সনদের আওতাভুক্ত সকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হবে।

(৪৫) যখন তাদের কোনো প্রকার চুক্তি বা সনদ করতে বলা হবে তখন তারা তা করবে এবং সেটা মেনে নিবে।

(৪৬) আউস গোত্রের ইহুদীগণ ও তাদের অনুগত ব্যক্তিগণ এই সনদের সমর্থকদের সঙ্গে যতদিন পর্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের সনদের আওতাভুক্ত লোকদের সমমর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা এই সনদের সত্যকার বাস্তবায়নকরী।

(৪৭) এই সনদ কোনো অন্যায়কারী বা বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দেয় না। অন্যায় বা বিশ্বাসঘতকতা করে যে বাইরে চলে যায়, সে নিরাপদ এবং যে ভিতরে থাকে সেও মদিনায় নিরাপদ। যারা সৎকর্মে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বাণী বাহক। আইয়্যামে জাহেলিয়া বলতে অজ্ঞতার যুগে, বর্বরতার যুগে, কুসংস্কারের যুগে, অন্ধকারের যুগে বা তমস্যার যুগে সময় ও কাল বিচারে মদীনা সনদ ছিল অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মদীনার সনদ যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মদীনা সনদ নবী (ﷺ)-এর অসামান্য ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগে নয়; বরং সর্বযুগে ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচালক। পৃথিবীবাসীকে প্রথম লিখিত সংবিধান উপহার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁর (ﷺ) প্রতি শত শত দরূদ ও সালাম। সুমহান আদর্শ প্রচারের জন্য মহানবী (ﷺ)-কে মনে পড়ে পাখি ডাক ভোরে, রোদেলা দুপুরে, সূর্যের সামনে, জ্বলন্ত মোমের আড়ালে, হেলে যাওয়া বিকেলে, শান্ত গোধুলিতে, শিশির ভেজা সকালে, কনকনে শীতে, মুষল ধারা বৃষ্টিতে, চাঁদের সুষমা ভরা রাতে, চেতন-অবচেতন মনে আর দিনে পাঁচবার মুয়াজ্জিনের সুমধুর, সুললিত, লালিত্যময়, জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বা আজানের ধ্বনিতে।

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন:

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[সপ্তম পর্ব]

উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে হতে নিম্নে বিষয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাবের পর্যালোচনা করা হলো–

(খ) তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাবলী:

১. যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত্ তাফসীল– এটি আট খণ্ডে সমাপ্ত অতি প্রসিদ্ধ একটি তাফসীর গ্রন্থ।[১] ইব্নুল জাওযী এ গ্রন্থে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন। পূর্ববর্তী তাফসীরকারকদের তাফসীর গ্রন্থ রচনায় যে সব ভুল-ত্রুটি তাঁর নিকট পরিলক্ষিত হয়েছে তিনি এ গ্রন্থে সেগুলো সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়কে সন্নিবেশিত করেছেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করেছেন। এছাড়া তিনি এতে বহুল ব্যবহৃত ও কম ব্যবহৃত উভয় ধরণের কিরাআত সন্নিবেশিত করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করেছেন। আয়াতের অর্থ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবনের জন্য কুরআনের শব্দসমূহের ব্যাখ্যা এবং উৎসসমূহের উল্লেখ করেছেন।[২]

ইব্নুল জাওযী এ তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস এবং প্রসিদ্ধ মুফাস্সির সাহাবীদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন। এরপর তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, ইকরামা ইবনু 'আব্দিল্লাহ, তা'উস আল-ইয়ামানী, 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ, আবুল আলীয়াহ, হাসান আল বাসরী প্রমুখ উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের বর্ণিত তাফসীরের ওপরও নির্ভর করেছেন। পরবর্তীকালের যে সব সূত্র থেকে তিনি তথ্য উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে ইবনু জারীর আত তাবারীর জামি'উল বায়ান, ইবন কুতায়বার তা'বীলুয মুশকিলিল কুরআন, আল ফাররার মা'আনিল কুরআন ও যাজজাজ এর মা'আনিল কুরআন, আবূ আলী আল ফারিসী রচিত আল-হুজ্জাহ, আবূ উবায়দাহ রচিত মাজাযুল কুরআন প্রভৃতি। তিনি এসব গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে হুবহু গ্রন্থকারের ভাষা। আবার কখনো তিনি গ্রন্থকারেরর ভাষা ব্যবহার না করে নিজের ভাষায় কোনো বিষয়ে ব্যক্ত করলে তা তাঁর নিজের ভাষায় সে কথাও উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী এ গ্রন্থে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে সাহাবী, তাবি'ঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতগুলো উপস্থাপন করেছেন। এতে গ্রন্থকার নিরাসক্তভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তুলে ধরেছেন। তিনি নিজে মাযহাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মাযহাবের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটেনি। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়েই তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সংযমের সাথে ফিকহী মাসআলার যথার্থ সমাধান প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে এটি তথ্য সমৃদ্ধনির্ভরযোগ্য ও বহুবিধ জ্ঞান সমৃদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি মাকতাবাতুল মাশহাদির রিযা, মাকতাবাতুল ইসকূরিয়াল, দামিশকের মাকতাবাতুয যাহিরিয়্যাহ্, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩] এটি বৈরূতের দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, সিরিয়ার আল-মাকতাবুল ইসলামী,[৪] পেশোয়ারের মাকতাবাতু হাককানিয়্যাহসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত সংস্করণের কপি আমার সংগ্রহে রয়েছে।

২. তাযকিরাতুল মুনতাবিহ ফী 'উয়ূনিল মুশতাবিহ– এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। হাজী খলীফা ও ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী এ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে মহান আল্লাহর প্রশংসা, কুরআনের পঠন ও কুরআনের মাতাশাবিহতা আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৫]

৩. ফুনূনুল আফনান ফী 'উলূমিল কুরআন (فنون الافنان فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْآن)**:** এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থটি অন্য শিরোনামেও ঐতিহাসকগণ উল্লেখ করেছেন। আয-যাহাবী "فنون الافنان" শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন। এর পাণ্ডুলিপি বাগাদের মাকতাবাতুল আওকাফ এ সংরক্ষিত আছে।[৬]

---

* *প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।*

[১] *আল-বিদায়াহ-ওয়ান নিহায়াহ্*, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৮; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭।

[২] *ইব্নুল জাওযী, যাদুল মাসীর*, ১ম খণ্ড (পেশোয়ার: মাকতাবাতু হাক্কানিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৩-৬।

[৩] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১০৭।

[৪] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৪৮।

[৫] *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১; *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১।

[৬] *তাযকিরাতুর হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৩০; *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯২।

৪. আল-মুদহিশ– এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। এটির পাণ্ডুলিপি বাসরার আল মাকতাবাতুল আব্বাসিয়্যাহ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঈসমা'ঈল আল-বাগদাদী ও হাজী খলীফা এটিকে "المدهش فى المحاضرات" যিরিকলী, ব্রুকলম্যান ও আয-যাহাবী المدهش শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[১] বাগদাদে মাতবা'আতুল আদাব কর্তৃক এটি ১৩৪৮ হিজরিতে "المدهش فى علوم القران والحديث واللغة والتاريخ و الوعظ" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[২] গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে সুবিন্যাস্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে তাফসীর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য, তৃতীয় অধ্যায়ে হাদীস, চতুর্থ অধ্যায়ে ইতিহাস এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন উপদেশ আলোচিত হয়েছে।[৩]

৫. আল মুগনী ফী তাফসীরিল কুরআন– আয-যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে المغنى فى علوم القران ও ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী হাদিয়াতুল আরিফীন গ্রন্থে "المغنى فى تفسير القران" শিরোনামে এবং হাজী অলীফা কাশফুয যুনূন গ্রন্থে "المغنى فى التفسير" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির প্রারম্ভে খুতবার পরপর গ্রন্থকার এতে আল-কুরআনের বিভিন্ন খণ্ডিত আয়াতে তাফসীর করেছেন। এটি একটি ফলপ্রদ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইব্নুল জাওযী নিজেই বলেন,[৪] فمن سمت همته إلى زيادة شرح فعليه كتابى المسمى المغنى।

৬. নাওয়াসিখুল কুরআন– কেউ কেউ বলেছেন, এটি উমদাতুর রাসিখ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন। যাহবী এটিকে "الناسخ والمنسوخ" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এর পাণ্ডুলিপি মদীনার আল মাকতাবাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ এবং দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৫] এটি মোহাম্মাদ আশরাফ আলী আল-মালবারীর সম্পাদনায় ইহইয়াউত তুরাস আল আসলামী কর্তৃক ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আল উযূহুন নাওয়াযির ফিল উজূহি ওয়ান নাযাইর– এ গ্রন্থে ধর্মীয় সামাবেশে ইনুল জাওযীর উপস্থাপিত তাফসীরের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে সময়ে রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা বিধৃত হয়েছে।[৬] তাযকিরাতুল হুফফায সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ও ঈযাহুল মাকনূন গ্রন্থে এটি الوجوه والنظائر শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] ইবন রজব একে কুরআন অভিজ্ঞানের মূলনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] এছাড়াও 'উলূমুল কুরআন বিষয়ে তার লিখিত তাইসিরুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, তাযকিরাতুল আরীব ফী তাফসীরিল গারীব, গারীবুল গারীব, ওয়ারদুল আগসান ফী ফুনূনিল আফনা ও 'উমদাতুর রাসিখ ফী মা'রিফাতিল মানসূখ ওয়ান নাসিখ অন্যতম গ্রন্থ।[৯]

(গ) আল-হাদীস বিষয়ক রচনাবলী:

১. আল-মাওযূ'আত মিনাল আহাদীসিল মারফূ'আত– এ গ্রন্থের একাধিক নাম পওয়া যায়। ব্রুক্যালম্যান এ গ্রন্থের নাম কিতাবুল মাওযূ'আত মিনাল আহাদীসিল মারফূ'আত উল্লেখ করেছেন।[১০] গ্রন্থটি খ্যাতনামা মুফাস্সির, মুহাদ্দিস শায়খ ইমাম আবূল ফারায 'আব্দুর রহমান ইব্নু 'আলী ইব্নে মুহাম্মাদ ইব্নুল জা'ফার ইব্নু আল-জাওযী (রহিমাহুল্লাহ-র) (মৃত: ৫৯৭ হি.) রচনা করেন।[১১] গ্রন্থটিকে আয-যাহাবী ও ইব্নু খাল্লিকান الموضوعات; হাজী খলীফা 'আল-মাওযূ'আত আল-কুবরা' (الموضوعات الكبرى) এবং আল-বাগদাদী 'আল-মাওযূ'আত ফিল আহাদীসিল মারফূ'আত' (الموضوعات فى الاحاديث المرفوعات) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২] এ গ্রন্থে ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ-র) সে সকল মাওযূ' হাদীস আলোচনা করেছেন, যার ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন প্রবৃত্তি-পূজারী

---

[১] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪৫; *হাদিয়াতুল আররিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২; *তাযকিরাতুর হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *আল আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

[২] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪১-১৪২।

[৩] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪৫।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৫; *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫০; *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩; *মুআল্লাফাতু ইব্নিল জাওযী*, পৃ. ১৭১।

[৫] ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৯৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

[৬] *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০১।

[৭] *ঈযাহুল মাকনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০২; *তাযকিরাতুয হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

[৮] *মুআল্লাফাতু ইব্নিল জাওযী*, পৃ. ২০১।

[৯] *আল-মাওযূআত মিনাল আহাদীসিল মারফূ'আত ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।*

[১০] ব্রুকলম্যান, *তারীখুল আদাব আল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২।

[১১] ড. মো. রফীকুল ইসলাম, *ইবনুল জাওযী জীবন ও তাফসীর চর্চা, পৃ. ৯৮;* ব্রুক্যালম্যান, তারীখুল আদাব আল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬১-৬৬২।

[১২] *তাযকিরাতুয হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; *কাশফুয যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০৬; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২; *মুআল্লাফাতু ইব্নলি জাওযী*, পৃ. ১৭১; *আল আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

বিদ'আতপন্থীরা অসংখ্য গোমরাহী ও ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল। তৎকালে এসব ভ্রান্ত ধারণা নির্মূলে গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[১] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। মাওযূ' হাদীস বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। এটি আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ 'উসমান এর সম্পাদনায় ১৩৮৬/১৯৬৬ ও ১৪০৩/১৯৮৩ সালে দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত হয়।[২] সর্বশেষ ড. নূরুদ্দীন ইব্নু শুকর ইব্নে 'আলী বুইয়াজীলার আল-বুয্দুরি কর্তৃক তাহ্ক্বীক্ব ও সম্পাদনায় মাক্তাবাতু আয্ওয়াইস-সালাফি বির রিয়াদ সৌদি 'আরব থেকে ১৪১৮ হি. মোতাবেক ১৯৯৭ খ্রি. মোট ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৩]

২. আখবারু আহলির রুসূখ– হাদিয়াতুল আ'রিফীন গ্রন্থে এটি "اخبار اهل الرسوخ فى الفقه والحديث بمقدار المنسوخ" শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে।[৪] এটির পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, হায়দারাবাদের আল-মাকতাবাতুল আসফিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এটি ইপ্রু হাজার আসকালানীর মারাতিবুল মুদাল্লিসীন গ্রন্থের সাথে আল-মাতবা'আতুল হুসাইনিয়্যাহ, কায়রো থেকে ১৩২২ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে। বোম্বে থেকেও এটি প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

৩. আত্-তাহ্ক্বীক্ব ফী আহাদীসিল তা'লীক– ব্রুকলম্যান, যিরিকলী, হাজী খলীফা এবং ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী এ শিরোনামে গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন।[৬] গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আল-খাদীবিয়্যাহ, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে।[৭]

৪. কিতাবুয যু'আফাই ওয়াল মাতরুকীন– গ্রন্থটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। আয-যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে "الضعفاء" শিরোনামে এবং যিরিকলী আল-আ'লাম গ্রন্থে "اسماء الضعفاء والواضعين" শিরোনামে একে উল্লেখ করেছেন।[৮] এর পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৯] ইবনুল জাওযীর জামিউল মাসানিদ বিল খাসসিল আসানিদ, আল-হাদায়িক, 'উয়ূনিল হিকায়াত, আন-নুযহা, আল-মুজতাবা, আখায়িরুয যাখায়ির, গারারুল আছর, আল 'ইলাল আল-মুতানাহিয়া ফীল আহাদীছিল ওয়াহিয়াসহ প্রভৃতি হাদীস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১০]

(ঘ) আল ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলী:

১. আহ্কামুল নিছা– গ্রন্থটি একশত দশটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত। এ গ্রন্থে ইবনুল জাওযী সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ প্রভৃতি 'ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে, নারীদের জন্য বিভিন্ন সতর্কী মাসআলা আলোচনা করেছেন। এছাড়া নারীদেরকে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর তিনি নারীদের মর্যাদা এবং চরিত্রে গঠনে নারীদের প্রভাব আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি মিসর ও বৈরুত থেকে বেশ কয়েকবার প্রাকশিত হয়েছে।[১১] ১৩১৯ হিজরিতে এটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। এর পাণ্ডুলিপি দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ ও দামিশকরে আল মাকতাবাতুয যাহিরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১২]

২. দাফ'উ শুবহাতিত তাশবীহ ওয়ার রাদ্দু আলাল মুজাসসিমাহ– গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত। আয যিরিকলী এ নামটি উল্লেখ করেছেন। ইসমা'ঈল আল-বাগদাদী "دفع شبه المشبته" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এটি দামিশকের মাতবা'আতুত তারাককী থেকে ১৩৪৫ হিজরিতে "دفع شبه التشبيه والرد على المجلسة" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১৩] এর মূল পাণ্ডুলিপি আল খাযানাতুত তায়ূরিয়্যাহ বি দারিল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে।[১৪] *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

---

[১] *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৪৭১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; তারীখে দা'ওয়াত ও আযীমাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

[২] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪৫।

[৩] *কিতাবুল মাওযূ'আত মিনাল আহাদীছিল মারফূ'আত*, ১ম খণ্ড, কভার পেজ।

[৪] *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১।

[৫] *ইসলাম বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*. পৃ. ৬৫-৬৬।

[৬] *আল আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ১৪৫; *কাশফুয যুনূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; *হাদয়াতুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১।

[৭] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*. পৃ. ৮১।

[৮] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪র্থ খণ্ড (উর্দু অনুবাদ), পৃ. ৯০৬; *আল আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

[৯] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*. পৃ. ১৩৭।

[১০] *আল-মাওযূআত মিনাল আহাদীছিল মারফূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১।

[১১] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৫১।

[১২] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ৬৪।

[১৩] *হাদয়িতহুল আরিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১; *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*, পৃ. ৯৮-৯৯; *আল আ'লাম* , ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

[১৪] *মুআল্লাফাতু ইবনিল জাওযী*. পৃ. ৯৯।

ক্বাসাসুল কুরআনঃ / قصص الحديث

নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

আদম (আলায়হিস সালাম)-এর ইন্তেকালের পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। শয়তানের ধোঁকায় মানুষ ধীরে ধীরে মূর্তিপূজা করতে শুরু করেছে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে একজন নবী পাঠান–যিনি এক আল্লাহর দা'ওয়াত দেন, শির্ক না করার নসিহত করেন। তার নাম নূহ্ (আলায়হিস সালাম)। নূহ্ (আলায়হিস সালাম) সাড়ে নয়শো বছর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়কালে অক্লান্তভাবে তিনি কেবল দা'ওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। কী সকাল, কী বিকাল; কী দিন, কী রাত; প্রকাশ্যে কিংবা চুপিসারে–তিনি শুধু এ কথাই বলে গেছেন,

﴿فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর 'ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?"[৯৬]

কিন্তু কেউ তার দা'ওয়াতে সাড়া দেয়নি; বরং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কানে আঙ্গুল দিয়ে কিংবা নিজেকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে সটকে পড়েছে, তার প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছে। একদম শেষে তিনি বদদু'আ করেন,

﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না। আপনি যদি তাদেরকে ছেড়ে দেন তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্তকরবে এবং যারা জন্ম লাভ করবে তারা হবে দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।"[৯৭]

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি বিশাল নৌকা তৈরি করতে বলেন। কীভাবে নৌকা বানাতে হবে আল্লাহ তা'আলাই শিখিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۞ قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۞ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ

[৯৬] *সূরা আল-মু'মিনূন: ২৩।*
[৯৭] *সূরা নূহ: ২৬-২৭।*

الْجٰهِلِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

"তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তারা তো নিমজ্জিত হবে।' সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার নিকট দিয়ে যেত, তাকে উপহাস করত; সে বলত, 'তোমরা যদি আমাকে উপহাস করো তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ; এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কার ওপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর তার ওপর পতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।' অবশেষে যখন আমার আদেশ আসলো এবং উনান উথলিয়ে উঠল; আমি বললাম, 'এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দু'টি, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে।' তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল অল্প কয়েকজন। সে বলল, 'এতে আরোহণ করো, মহান আল্লাহর নামে এটার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে বেয়ে চলল; নূহ্ তার পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, আহ্বান করে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না।' সে বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে।' সে বলল, 'আজ মহান আল্লাহর হুকুম হতে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন সে ব্যতীত। এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এরপর বলা হলো– 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জুদী পর্বতের ওপর স্থির হলো এবং বলা হলো, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক। নূহ্ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।' তিনি বললেন, 'হে নূহ্! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আপনার কাছে চাওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' বলা হলো, 'হে নূহ্! অবতরণ করো আমার পক্ষ হতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দিব, পরে আমার হতে মর্মান্তিক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।"[৯৮]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নৌকাটি লম্বায় ছিল ১২০০ হাত, আর পাশ ছিল ৬০০ হাত।' উচ্চতা ছিল ৩০ হাত, তিনতলা ছিল– নিচতলায় কীট-পতঙ্গ ও জন্তু-জানোয়ার, দোতলায় মানুষ আর তেতলায় থাকবে পাখ-পাখালি।[৯৯]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۞

"অতঃপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান

[৯৮] *সূরা হূদ: ৩৭-৪৮।*
[৯৯] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনু কাসীর, ১/২৫৮, ই. ফা. বাং।*

নির্মাণ করো, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলিয়ে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, উঠিয়ে নিও ঐ সকল লোকদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না যারা যুল্‌ম করেছে। তারা তো নিমজ্জিত হবে।"[১০০]

যেহেতু ওই অঞ্চলে কখনোই বন্যা হয়নি, বছরের বেশিরভাগ সময় খরা থাকত, তাই কাফেরেরা নৌকা নিয়ে হাসি-মজাক করত। তারা ঠাট্টা করে বলত, নূহ্ এতদিন ছিলে নবী, নবুওয়তি ছেড়ে এখন হয়েছ কাঠমিস্ত্রি! অবশেষে নির্দিষ্ট দিন আসে। নূহ্ (আলাইহিস সালাম) নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ৮০ জন মু'মিন এবং পশু-পাখি নিয়ে নৌকায় চড়ে বসেন। তারা নৌকায় ওঠার পরেই আকাশ ভেঙ্গে তুফান শুরু হয়, মাটির নিচ থেকেও পানি উঠতে শুরু করে। দুই দিকের পানি মিলে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়েরও ১৫ হাত উপরে পানি উঠে যায়। দুনিয়ায় থাকা এমন একজন কাফিরও ছিল না যে মহান আল্লাহর এই 'আযাব থেকে বাঁচতে পেরেছে। বিশাল এই নৌকাটি ১৫০ দিন ভেসে বেড়ায়, তারপর জুদি পাহাড়ে নোঙর ফেলে।[১০১]

বাইবেলে ১৫০ দিন ব্যাপী পানি বৃদ্ধির উল্লেখ এবং ইয়াহূদী কিংবদন্তীতে ৩৬৫ দিন পর কিশ্‌তী হতে অবতরণের উল্লেখ রয়েছে।[১০২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقِيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾

"হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গিলে ফেলো এবং তুমি ক্ষান্ত হও। অতঃপর নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা জুদী পর্বতের উপরে স্থির হলো।"[১০৩]

জূদী পর্বত কুর্দিস্থানের জাযীরা ইবনু 'উমার এলাকার উত্তর পূর্বে অবস্থিত। বাইবেলে যে "আরাবাত"-এর উল্লেখ আছে সেটি এ পর্বতশ্রেণীর প্রসিদ্ধ নাম, আর জুদী এ পর্বত শ্রেণীর অন্যতম। এ পর্বতটি আবাবাত ও ররজিস্থান-এর পর্বতশ্রেণীকে সংযুক্ত করে। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহেও জুদীতে কিশতী থামবার উল্লেখ রয়েছে। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আড়াই বছর পূর্বে Berasus নামে ব্যবিলনের এক এক ধর্ম যাজক প্রাচীন কিংবদন্তীর ভিত্তিতে রচিত নিজ দেশের ইতিহাসে কিশ্‌তী আসবার স্থান জুদী উল্লেখ করেছেন। এরিস্টটলের শিষ্য Ebydenus ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এর সমর্থন করেছেন।[১০৪]

ব্যাবিলন খননকার্যের ফলে যে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে এতে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এ প্লাবনের সময়কাল ৩২৩২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ বলে অনুমান করা হয়।[১০৫]

এ প্লাবন কি বিশ্বব্যাপী ছিল না আঞ্চলিক? বাইবেলে ও ইয়াহুদী বর্ণনায় এটা বিশব্যাপী। কিন্তু কুরআন কারীমের কোনো কোনো আয়াতে, যথা-

﴿وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا﴾

"যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখান করেছিল, তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করে দিলাম।"[১০৬]

এটি স্থানীয় হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি ও কিংবদন্তী হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, এ প্লাবনের পরিধি ছিল মোট চল্লিশ হাজার কিলোমিটার এবং প্লাবন দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘটেছিল। কিন্তু সে সময়ে মানুষের বসতি শুধু ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু ঐ অঞ্চলে ধ্বংসের ওপর–

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا﴾

---

[১০০] *সূরা আল-মু'মিনূন: ২৭।*
[১০১] *আল-বিদায়া- ইবনু কাসীর, ১/১০৯।*
[১০২] *The Jewish Encyclopaedia- ১/৩২০, ই. ফা. বাং; ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪/২২৪।*
[১০৩] *সূরা হূদ: ৪৪।*
[১০৪] *তাফহীমুল কুরআন- মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী, ২য় খণ্ড, (দিল্লী: মাকতাবাঃ মারকাযী, ১৯৯২ খৃ.) পৃ. ৩৪১।*
[১০৫] *মাসাইল ওয়াকিসাস- আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, পৃ. ১০৭; ইসলামী বিশ্বকোষ- ই. ফা. বাং, ১৮/২২৫।*
[১০৬] *সূরা আল-আ'রাফ: ৬৪।*

"হে আমার রব! এ ভূখণ্ডে কাফিরদের মধ্যে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।"[১০৭]

এ জাতীয় আয়াত প্রযোজ্য হয়েছে।[১০৮]

অবশ্য কোনো কোনো মুফাস্সির এ প্লাবনকে বিশ্বব্যাপী বলেও উল্লেখ করেছেন। এ প্লাবনের ঘটনা প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি জাতির নিকটই বিদিত। ব্যাবিলনের খননকার্যে যে প্রাচীন শীলালিপি পাওয়া গিয়েছে এতেও এ প্লাবনের উল্লেখ এবং এর নায়কের নাম বলা হয়েছে U + Napistim।[১০৯]

ভারতে হিন্দু সম্প্রদায় এ ঘটনার মূল নায়ক মনু (মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতা) বলে ধারণা করা হয়।[১১০]

এতদ্ব্যতীত গ্রীক, মিসর, চীন, বার্মা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্যে এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।[১১১]

যার থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানবজাতি এ প্লাবনের দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছে। ইসরাঈলী ও কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, প্লাবনের পর মানব বংশ নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর তিন পুত্র (হাম, সাম, ওয়াফিস বা ইয়াফেজ) হতে উদ্ভূত সকল নবীর পিতৃ সম্পর্ক ছিল নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে।[১১২]

নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘনিষ্ঠ স্বজনদেরকে তাঁর নৈকট্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন: প্রথমত, তাঁর স্ত্রীকে, যে বিধর্মী ছিল এবং কাফিরদের সাথে সদ্ভাব রাখতো। তাঁর নাম ছিল নামাহ (Noamah) অথবা ইমারাযা (Imarza) বিনতু রুকায়ল। নূহ্ (আলাইহিস সালাম) ৪৮৮ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে করেন।[১১৩]

[১০৭] *সূরা নূহ: ২৬।*
[১০৮] *তাফসীরে রুহুল-মাআনী; তাফসীর মাজহারী; সীওহারবী- ১/৭৬; ইসলামী বিশ্বকোষ- ই. ফা. বাং, ১৪/২২৫।*
[১০৯] *Encyclopaedia Britanica- ১৬/২৭৬; ইসলামী বিশ্বকোষ- ই. ফা. বাং, প্রাগুক্ত।*
[১১০] *তারীখুল আদাবি'স-হিন্দী- আবুন-নাসুর আহমদ হুসায়ন ভূপালী, ৩৪-৩৫; ইসলামী বিশ্বকোষ- ই. ফা. বাং, ১৪/২২৫।*
[১১১] *তাফহীমুল-কুরআন- মওদূদী, ২/৪০।*
[১১২] *সূরা মারইয়াম: ৫৮; সূরা বানী ইসরা-ঈল: ৩।*
[১১৩] *The Jewish Encyclopaedia- ৯/৩২০।*

প্লাবনের আয়াতে তার উল্লেখ না থাকায় ধারণা করা হয় যে, প্লাবনের পরেই তার মৃত্যু হয়েছিল এবং এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।[১১৪]

দ্বিতীয়তঃ নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র কিন'আনও কাফির ছিল। আল্লাহ তা'আলা অন্যান্যের সাথে তাকেও প্লাবনে নিমজ্জিত করেন এবং তার সম্পর্কে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কৃত দু'আ নামঞ্জুর করেন। কুরআন কারীম ও বাইবেল হতে জানা যায় যে, নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ যে দীন দান করেছিলেন তা অপর সকল নবীর দীন হতে ভিন্ন।[১১৫]

ইবনু কাসীর মারফু হাদীসের সূত্রে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর শরী'আতের সাওম, হজ্জ ও ওসিয়্যাতের উল্লেখ করেছেন।[১১৬]

আল-আযরাকী (আখবার-মক্কা) প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের মতে নূহ্ (আলাইহিস সালাম) প্লাবনের পর পবিত্র বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ কর্মও সম্পন্ন করেছিলেন।[১১৭]

নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর মহাপ্লাবন হতে শিক্ষা

১. চরম প্রতিকূলতায়ও একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। নূহ্ (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর অনুসারীরা মহান আল্লাহর আদেশে নৌকা তৈরি করে নিরাপদে ছিলেন।

২. দীর্ঘ সময় ধরে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং অবিশ্বাসীদের উপহাসের মুখে ধৈর্য ধারণের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নূহ্ (আলাইহিস সালাম)।

৩. নবী ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি ভয়াবহ। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে কোনো আত্মীয়তা (যেমন- নূহের পুত্র কানআনের ঘটনা) বা ক্ষমতা রক্ষা করতে পারে না।

৪. ঈমানদারদের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তা অবশ্যই আসে। মহাপ্লাবনের পর মু'মিনদের জন্য নতুন পৃথিবীর সূচনা মহান আল্লাহর দয়ার নিদর্শন।

[১১৪] *সূরা আত্-তাহ্রীম: ১০।*
[১১৫] *সূরা আশ্-শূরা-: ১৩।*
[১১৬] *আল-বিদায়া- ইবনু কাসীর, ১/১১১-১১২।*
[১১৭] *তাফসীর মাজহারী- ই. ফা. বাং,; ইসলামী বিশ্বকোষ- ই. ফা. বাং, ১৪/২২৫।*

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ১৩তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গতকাল ২৮ মার্চ, শনিবার জামালপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউজ্জামান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. ‘আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, ইয়াতীম ও দুস্থ-মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন।

এছাড়াও জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে (২০২৬-২০২৯) সেশনের জন্য জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং সেক্রেটারি হিসেবে অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ এপ্রিল, শনিবার, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যালয়ে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের সভাপতি শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

জেনারেল কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম এবং ফাতাওয়া গবেষণা বিষয়ক সহযোগী সেক্রেটারি শাইখ আব্দুন নূর মাদানী।

অনুষ্ঠানের সূচনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের অফিসের এক্সিকিউটিভ শাইখ মুহাম্মাদ ইসমাঈল।

সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি তার বক্তব্যে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মহানগর জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের সেক্রেটারি মোহাম্মদ গোলাম রহমান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চৌগাছায় জমঈয়তের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত, উপজেলা কমিটি গঠন

গত ১০ এপ্রিল ২০২৬ শুক্রবার, জুমুআর সলাতের পর যশোরের চৌগাছা উপজেলার পুড়াহুদা গ্রামে অবস্থিত মসজিদে তাকওয়া জামে মসজিদে (বাঁশের বেড়া ও টিনের চালবিশিষ্ট) এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় চৌগাছা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২০০ জন মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন আহলে হাদীস হিসেবে পরিচিত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক আহমেদ আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ, যুগ্ম সেক্রেটারি অধ্যাপক তৌহিদুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য মাওলানা জয়নাল আবেদীনসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং দাতা প্রতিনিধিগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দ্বীনের সঠিক দাওয়াত প্রচার, সংগঠনের ঐক্য এবং সুসংগঠিত কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। তারা সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে চৌগাছা উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বিবরণ: সভাপতি- তাইফুর রহমান, সহ-সভাপতি- ওবায়দুর রহমান, আবুল মুক্তাদির ও সুলতান আহমাদ, সেক্রেটারি- শরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- সবুজ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি- ডা. ওয়াজেদ আলী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- তোজাম্মেল হোসেন, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- রায়হান উদ্দীন,শহিদুল ইসলাম, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- আবু তালেব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- আব্দুল মান্নান, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- শাহ জালাল, পাঠাগার সম্পাদক- আব্দুর রহমান, দফতর সম্পাদক- মাসুদুর রহমান সদস্যবৃন্দ- শরিফুল ইসলাম শরিফ, নাঈম হাসান, আব্দুল করীম, জুল হোসেন, নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন, রায়হান উদ্দীন মুন্না, শিহাব উদ্দীন, আমিনুর রহমান, আবুল কালাম।

أخبار الشبان / শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে নীলফামারী জেলায় ৭১তম জুমু'আর খুতবাহ্ ও দা'ওয়াতি সফর অনুষ্ঠিত

গত ১৭ এপ্রিল ২০২৬, শুক্রবার, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মাঝে দ্বীন ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে নীলফামারী জেলায় এক দা'ওয়াতি সফর অনুষ্ঠিত হয়।

এ সফরের অংশ হিসেবে জলঢাকা উপজেলায় প্রায় ১০টি মসজিদে জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। তাদের বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠন, সমাজের নৈতিক উন্নয়ন এবং দ্বীনের সঠিক অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

একই দিন বাদ আসর জলঢাকা উপজেলার শৌলমারী বড়বাড়ি জামে মসজিদে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় আলেম-উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বীনি কার্যক্রম আরও বেগবান করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

উক্ত সফরে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দাওয়াহ সহযোগী বিষয়ক সেক্রেটারি-২ শাইখ আবু রায়হান সিদ্দিকী, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রায়হান উদ্দিন মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফেয হাবিবুর রহমান মাদানী, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক শাইখ নাজিবুল্লাহ, কার্যকরী সদস্য শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, দিনাজপুর জেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ এনামুল হক মাদানী এবং নীলফামারী জেলা শুব্বানের সভাপতি আসাদ বিন সিরাজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সফরটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং দ্বীনি দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দু'আর আবেদন

(১) যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ফতেপুর কাউন্সিল বাজারে অবস্থিত জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠান "প্রফেসর ড. এম. এ. বারী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদ্‌রাসা"-এর সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ জনাব কাদেরুজ্জামান নিঠুর মমতাময়ী মা (৮০ উর্ধ্ব) স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি তাঁর প্রিয় মায়ের সুস্থতার জন্য সবার কাছে আন্তরিকভাবে দু'আ কামনা করেছেন।

(২) ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মাতা (৯৬) স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা নাজুক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দ্রুত সুস্থতা দান ও কষ্ট লাঘব করুন– এ জন্য সকলের নিকট আন্তরিক দু'আ কামনা করা হচ্ছে।

(৩) জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ মো. হেদায়াতুল্লাহ অসুস্থজনিত কারণে ইসলামী ব্যাংক স্পেশালাইজড অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. 'আব্দুল্লাহ ফারুক ও কেন্দ্রীয় দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাইখ উবায়দুল্লাহ মাদানী তাকে হাসপাতালে দেখতে যান।

আমরা সকলে তার জন্য দু'আ করি– আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদেরকে শিফায়ে কামিলা দান করেন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র পিতা, ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা মোহাম্মদ ইদরীস গত ১৪ মার্চ, ২৪ রমাযান রাতে ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল শতাধিক।

মরহুম মিরপুর এলাকায় আহলে হাদীসদের ঐক্যবদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও, ঢাকার মিরপুরে মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ ও মসজিদ বাইতুল হক্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুকালে তিনি ৮ পুত্র, ৪ কন্যা এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মাইয়্যেতের জানাযার সলাত তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) সৌদি আরব আল সাজির ইসলামিক সেন্টারের দাঈ' শাইখ আব্দুর রহীম মাদানী ব্রেইন স্ট্রোক করে উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকালে ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষা শেষ করে জমঈয়তের তাজকিয়া নিয়ে মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য গমন করেন।

উভয়ের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দু'আ কামনা করা হচ্ছে।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***আমি টিউশনি করাই, এখন আমার যে পেমেন্ট আছে এটা যদি কেউ হারাম টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে সেটা আমার জন্যও কি হারাম হবে? দয়া করে দ্রুত জানাবেন।*** *শিহাব উদ্দিন*

ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব: আপনার টিউশনী যদি শরীয়তসম্মত হয় তাহলে আপনার পারিশ্রমিকও হালাল; যদিও আপনার নিয়োগদাতার ইনকাম হারাম হয়। সে হারাম পন্থায় ইনকাম করলে উক্ত সম্পদ তার জন্য হারাম হবে, আপনার জন্য নয়।

জিজ্ঞাসা (০২): ***আমি একজন ওসওয়াসা রোগী বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই ত্বালাক্বের ওসওয়াসা আমার মধ্যে দেখা দেয়। আমার জিজ্ঞাসা আমি যদি মুখে ত্বালা-ক্ব না বলি, কিন্তু অন্তরে ত্বালা-ক্ব দেওয়ার বাসনা সুপ্ত থাকে অথবা ইশারা ইংগিতে ত্বালাক্বের কথা বুঝাই তাহলে কি ত্বালা-ক্ব হবে?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

জবাব: আপনি যদি এমন পর্যায়ের ওয়াসওয়াসার রোগী হন যে, ওয়াসওয়াসা আপনার বুদ্ধি-বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ফলে স্বাভাবিকতা লোপ পেয়েছে তাহলে প্রকাশ্যে ত্বালাক্বের শব্দ উচ্চারণ করলেও ত্বালা-ক্ব হবে না। আর ইঙ্গিতে ত্বালা-ক্বা পতিত হওয়ার জন্য ইঙ্গিত মূলক কথার সাথে অন্তরের নিয়ত শর্ত। শুধু ইঙ্গিতে ত্বালা-ক্ব দিলে ত্বালা-ক্ব হয় না এবং শুধু ত্বালাক্বের নিয়ত করলেও ত্বালা-ক্ব পতিত হয় না।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমার চাচা তার স্ত্রীকে একবারে তিন ত্বালা-ক্ব দিয়েছে, উল্লেখ্য তিনি এর আগেও একবার ত্বালা-ক্ব দিয়েছিলেন। এখন তারা এক সাথেই থাকছে। এক্ষেত্রে কি তাদের সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্নের করতে পারবো?*** *সাদিক, দিনাজপুর।*

জবাব: আপনার ভাষ্য মতে যদি তাদের মাঝে ত্বালা-ক্ব হয়ে থাকে। তারপরেও তারা একসাথে বসবাস করছে। এ ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব হলো তাদের নসীহা করা, ত্বালা-ক্ব সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান অবগত করানো। যদি এরপরেও তারা তাদের পাপের পথে অবিচল থাকে তাহলে আপনি তাদের সাথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***বিজয় ও শহীদদের স্মরণে আমরা অনেকে মিলে নফল সিয়াম রাখতে চাচ্ছি। এভাবে নফল সিয়াম রাখা আদৌ শরিয়াহসম্মত কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।*** *শিহাব উদ্দিন*

ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব: বর্ণিত পদ্ধতিতে নফল সিয়াম পালন বৈধ হবে না দু'টি দিক থেকে। যথা- **১.** শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন কোনো দিন বা উপলক্ষের সাথে নফল সিয়ামকে নির্দিষ্ট করা যাবে না; করলে বিদআত হবে। **২.** মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল সিয়াম পালনের ব্যাপারে সঠিক মত হলো তা জায়িয নয়।

মৃত মুসলিম ব্যক্তির ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্য দু'আ করা শরীয়তসম্মত।

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আমার একজন পুত্র সন্তান আছে। 'আক্বিক্বাহ্ দিয়ে তার নাম রেখেছি আব্দুল্লাহ বিন শাহিন। এখন তার বয়স ৪২ দিন, জন্ম সনদ করবো। জন্ম সনদে কি নতুন করে "সাজিদ" নাম টা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?*** *মোহাম্মদ শাহিন*

ফতুল্লা, পাগলা বাজার, নারায়নগঞ্জ।

জবাব: জ্বি, আপনি আপনার সন্তানের নাম 'আক্বীক্বাহ্ দেওয়ার পরেও পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারবেন; এতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূল (ﷺ)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় সাহাবী এর নাম রাসূল (ﷺ) পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, 'নাম পরিবর্তন করলে 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হয়' –শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন। আমি কি এই কথাটি বলতে পারব মানুষের প্রযুক্তির ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির কারণে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে?*** *সাহাদ রহমান*

ফরিদপুর।

জবাব: একজন মুসলিম হিসেবে হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ তা'আলা ও তার সময়কাল আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তা আমাদের আবশ্যিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসের কারণ; এরূপ বলাতে কোনো দোষ নেই; যদি সে

বিশ্বাস করে যে, হায়াত-মউতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তবে কথাটি 'মানুষের প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার মহান আল্লাহর রহমতে হ্রাস পেয়েছে' বলার মাঝে তাওহীদের প্রতিফলন রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***আমি জানতে পেরেছি জামা'আতে সলাত আদায় করলে একাকী সলাত আদায়ের চাইতে ২৫-২৭ গুন বেশি সওয়াব হয় এখন কেউ যদি শেষ বৈঠকে এসে সলাত পায় এবং সেখান থেকে সালাত শুরু করে তাহলে সে কি জামা'আতে সলাত আদায়ের সবটুকু সওয়াব পাবে?***

সিয়াম শিকদার
চিতলমারী, বাগেরহাট।

জবাব: শেষ তাশাহহুদ পেলে জামা'আত পাওয়া বলে গণ্য হবে কিনা; এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে জামা'আত পাওয়া বলে গণ্য হবে। সুতরাং সে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ফযীলত পাবে। ***(দেখুন: আল-বাহরুল মুহীত্ব আস-সাজ্জাজ- ১৩/৩০১)***

জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গিয়ে যদি সালাত নাও পায় তবুও সে সদিচ্ছার কারণে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সওয়াব পাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করার পর মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় যে, সালাতের জামা'আত শেষ হয়ে গিয়েছে– আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ সওয়াব প্রদান করবেন– যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামা'আতের সাথে পুরা নামায আদায় করেছে। তাতে জামা'আতে সালাত আদায়কারীদের সওয়াব কম হবে না। ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫৬৪, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (০৮): ***সালাতের নিয়ত করার পর কোথায় হাত হাত রাখবে? রাফাউল ইয়াদাইন করার হুকুম কি? কুরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর জানতে চাই।***

মোহাম্মদ মুফিজুর রহমান
চট্টগ্রাম।

জবাব: সালাতের নিয়ত করার পর দুই হাত বুকের উপর রাখবেন। এর দলিল হলো– ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন। ***(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ৪৭৯)***

রাফউল ইদাঈন করার বিধান হলো সুন্নাত। সালাতে মোট চারটি স্থানে রাফউল ইদাঈন করতে হয়। যথা- **১.** তাকবিরাতুল ইহরামের সময়, **২.** রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে, **৩.** রুকূ' থেকে উঠার পর, **৪.** প্রথম তাশাহহুদ শেষে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার পর।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***যে ইমাম বিশ্বাস করে নবী গায়েব জানেন, জীবিত ও নূরের তৈরি। আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান ও মাজহাব মানা ফরয। তাহলে তার পিছনে সালাত হবে কি? এমতাবস্থায় জামা'আত ছেড়ে বাসায় সালাত আদায় করার বিধান কি?***

শরিফ ইবনু আব্দুল ওয়াহেদ
লালমনিরহাট, হাতিবান্ধা।

জবাব: উপরোক্ত বাতিল 'আক্বীদাতে বিশ্বাসী ইমাম সাহেবকে দলিলসহ বুঝাতে হবে। এরপরেও যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তার পিছনে সালাত আদায় বৈধ হবে না। এমন পরিস্থিতিতে যদি অন্য কোথাও বা বাড়িতে জামা'আতে সালাত আদায়ের সুযোগ না থাকে তাহলে একাকী সালাত আদায় করতে পারেন।

জিজ্ঞাসা (১০): ***সালাতুল ইশরাক, চাশ্‌ত, জাওয়াল, আওয়াবিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। কখন, কীভাবে, কত রাকাত পড়তে হয়?***

আব্দুল্লাহ খুবাইব
ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জবাব: সালাতুল ইশরাক ও চাশ্‌ত একই সালাত। মূলত চাশ্‌ত ফার্সি শব্দ, আরবিতে যাকে যোহা বলা হয়। সালাতুল ইশরাক বা যোহার সালাত পড়ার সময় হলো এক নেযা পরিমাণ সূর্যদয়ের পর হতে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। সালাতুল আওয়াবীন হলো সালাতুয যোহার আরেক নাম। হাদীসে এসেছে–

«لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ». «وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ».

অর্থ: যোহার সালাতের পাবন্দী করে একমাত্র আওওয়াব তথা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আর সালাতুয যোহা হলো সালাতুল আওওয়াবীন। ***(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ১২২৪)***

সালাতুয যোহা এর রাকআত সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই আর সর্বোচ্চের কোনো সীমা নেই, তবে রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণে আট রাকআতের বেশি না পড়াই উত্তম। কেননা তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ৮ রাকআত পড়েছিলেন।

জাওয়ালের সালাত বলতে সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ার পরে আদায়কৃত সালাতকে উদ্দেশ্য করা হয়। অর্থাৎ- সূর্য ঢলে পড়া ও যোহরের ওয়াক্তের সূচনালগ্নে পঠিত সালাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

নবী (ﷺ) বলেন: যোহরের পূর্বে চার রাকআত –যার মাঝে কোনো সালাম নেই, এ রাকআতগুলোর জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১২৭০, হাসান)***

জাওয়ালের সালাত এক সাথে চার রাকআত, মাঝখানে কোনো সালাম নেই।

জিজ্ঞাসা (১১): ***সালাতুত তাসবীহ এর বিধান কি এবং সালাতুত তাসবীহ কীভাবে পড়তে হয় বিস্তারিত জানতে চাই।***

মিজানুর রহমান
দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জবাব: সালাতুত তাসবীহ এর বিষয়ে বর্ণিত হাদীস সহীহ না হওয়ায় উক্ত সালাত প্রমাণিত নয় এবং তার উপর 'আমল করা জায়িয নয়। এরূপ মতামত প্রদান করেছেন ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ-হ), ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ-হ) এবং শায়েখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ-হ)-সহ প্রমূখ উলামাগণ। ***(দেখুন: আল-মাজমূ'- ৩/৫৪৮; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪২৯)***

জিজ্ঞাসা (১২): ***জানাযা সালাত হওয়ার পরে লাশের আগে মুসুল্লি কবরস্থানে যাওয়ার মাসয়ালা অথবা বিধান কি?***

মো. হোসনে মোবারক
কদমতলী, বাগবাড়ি, গাবতলী, বগুড়া।

জবাব: জানাযার সালাত হওয়ার পরে মুসল্লীদের জন্য লাশের আগে বা পরে করবস্থানে যাওয়া উভয়টি বৈধ। ফকীহগণ মতভেদ করেছেন লাশের আগে আগে যাওয়া উত্তম নাকি পিছনে? সঠিক মত বা জমহুর উলামাদের মত হলো লাশের আগে আগে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এর দলিল হলো– 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি রাসূল (ﷺ), আবূ বক্র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানাযার আগে আগে হেঁটে যেতে দেখেছি। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৩৭৯, সহীহ)***

জিজ্ঞাসা (১৩): ***তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিন কুম-এর সাথে 'ঈদুল ফিত্‌র/ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা' বা 'ঈদ মোবারক' বলা যাবে কি না?***

আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

জবাব: তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিন কুম-এর সাথে 'ঈদুল ফিতর/ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা' বা 'ঈদ মোবারক'সহ এ জাতীয় শব্দ বা বাক্য বলা যাবে যদি উক্ত শব্দে বা বাক্যে ইসলাম বিরোধী কিছু না থাকে।

"ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা জায়িয (কোনো সমস্যা নেই)। এ বিষয়ে চারটি মাজহাব হানাফী, মালিকী, শাফে'য়ী এবং হাম্বলী সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। ***(মাসয়ালা- আল মুগনী, ১৪৪০; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন- ২/১৬৯)***

সাহাবিরাও ঈদে পরস্পরে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। মুহাম্মদ ইবনু জিয়াদ আল-আলহানি (রাহিমাহুল্লাহ-হ) বলেন: "আমি আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি ঈদের দিনে তাঁর সাথীদের বলতেন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিননা ওয়া মিনকুম', অর্থাৎ- 'আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে ('আমল) কবুল করুন'।" ***(তামামুল মিন্নাহ- হা. ৩৫৪, ৩৫৫, হাসান)***

ইবন তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-হ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "ঈদের সময় যে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয় এবং মানুষের মুখে প্রচলিত কথা যেমন- 'ঈদ মুবারাক' ইত্যাদি এসবের কি শরীয়তে কোনো ভিত্তি আছে, নাকি নেই? আর যদি এর শরীয়তে কোনো ভিত্তি থাকে, তাহলে কী বলা উচিত?"

তিনি বলেন: "ঈদের দিনের শুভেচ্ছা যেমন- কেউ ঈদের সলাতের পর অপরকে সাক্ষাৎ করে বলে– تقبل الله منا ومنكم (আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের থেকে কবুল করুন), অথবা أحاله الله عليك ইত্যাদি এগুলো কিছু সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে তারা এমন করতেন।

এ ব্যাপারে ইমামগণ যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ-হ) প্রমুখ অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইমাম আহমাদ বলেছেন: "আমি নিজে কাউকে আগে থেকে (শুভেচ্ছা) শুরু করি না; কিন্তু কেউ যদি আমাকে আগে বলে, তাহলে আমি তার জবাব দিই। কারণ শুভেচ্ছার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু ঈদের শুভেচ্ছা প্রথমে শুরু করা কোনো নির্দেশিত সুন্নাহ নয়, আবার এটা নিষিদ্ধ কিছুও নয়।

অতএব, যে এটি করবে তার জন্য অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, আর যে এটি ছেড়ে দেবে তার জন্যও দৃষ্টান্ত আছে।" ***(মাজমূ' আল-ফাতাওয়া- ২৪/২৫৩; ফাতাওয়া আল-কুবরা- ২/২২৮)***

জিজ্ঞাসা (১৪): ***কোনো কারণে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়া হয় তখন যদি ভয় দেখানোর জন্য বা রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক ত্বালা-ক্ব দুই ত্বালা-ক্ব তিন ত্বালা-ক্ব বলে তাহলে কি ত্বালা-ক্ব হয়ে যাবে?***

নাজমুল হাসান
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জবাব: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়ার কারণে যদি ভয় দেখানোর জন্য বা রাগের মাথায় স্ত্রীকে এক ত্বালা-ক্ব দুই ত্বালা-ক্ব তিন ত্বালা-ক্ব বলে তাহলে স্ত্রী ত্বালা-ক্ব হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হলো– বিবাহ, ত্বালা-ক্ব ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২১৯৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৮৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২০৩৯, হাসান)***

সুতরাং কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া বা রাগের মাথায় ত্বালা-ক্ব দিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে।

তবে উলামাগণ রাগকে ৩ ভাবে বিভক্ত করেছেন:

১. হালকা রাগ, কী বলছে বুঝে বলেছে, ত্বালা-ক্ব কার্যকর হবে।

২. মাঝারি রাগ, রাগ আছে, কিন্তু বুঝে-শুনে বলছে, ত্বালা-ক্ব কার্যকর হবে (এটাই অধিকাংশ আলেমের মত)।

৩. প্রচণ্ড রাগ (নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই), কী বলছে বুঝছে না, পরে মনে থাকে না। এ অবস্থায় ত্বালা-ক্ব কার্যকর হবে না এটাই বিশুদ্ধ মতো।

দলিল: 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাগের অবস্থায় কোনো ত্বালা-ক্ব হয় না এবং দাসত্বমুক্ত করা যায় না। ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২১৯৩, হাসান; বিস্তারিত জানতে দেখুন: ইগাসাতুল্লাহফান ফি হুকমি তালাকিল গাযবান- লেখক: ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যা)***

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক সাথে ৩ ত্বালা-ক্ব দিলে এক ত্বালা-ক্ব কার্যকর হবে।

দলিল: ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এবং আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগে ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফাতের প্রথম দু' বছর পর্যন্ত তিন ত্বালা-ক্ব (ত্বালা-ক্ব) এক ত্বালা-ক্ব (ত্বালা-ক্ব) সাব্যস্ত হত। পরে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন। ***(সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩৫৩৭, বাং ই. সে., হা. ৩৫৩৬)***

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমি একসময় যিনায় লিপ্ত হয়েছিলাম, আমি কি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি? তাহলে এখন আমার করণীয় কি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব: যিনা নিঃসন্দেহে বড় পাপ। এর ধারে কাছেও যাওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" ***(সূরা ইসরা: ৩২)***

তবে তাওবায়ে খুলুসার মাধ্যমে আপনি আপনার অতীতে করা সে পাপের ক্ষমা পেতে পারেন। তাওবায়ে খুলুসা হলো– খালেস নিয়তে, অনুতপ্ত হয়ে, ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায়ে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে তাওবাহ্ করা, আল্লাহ তা'আলা উক্ত যদি আপনার উক্ত তাওবাহ্ কবুল করে তাহলে ক্ষমা পাবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

অতএব আপনি খাঁটি তাওবাহ্ করুন আর এ পাপের কথা মানুষকে বলে বেড়াবেন না। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করবেন।

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বড় পাপ, তাই মহান আল্লাহর রহমত হতে কখনো নিরাশ হবেন না।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***কোনো একটি কাজে আমার সালাত ছুটে যায়। এখন আমি খুব পেরেশানিতে আছি যে আমার ঈমান কি চলে গেছে অথবা আমি কি শিরককারী হয়ে গেছি? এখন আমার কি করণীয়, আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি।***

আরাফাত রহমান
ঢাকা।

জবাব: প্রথমে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার ঈমান চলে যায়নি বা আপনি শিরককারী হননি তবে নিঃসন্দেহে বড় পাপ করেছেন কেননা ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্ত সালাত ছাড়াও বড় পাপ।

ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ)-সহ এক দলের মতে কেউ ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দিলেও কাফির হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইবনু উসাইমিনসহ অপর দলের মতে সে কাফির হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত ইন্ শা-আল্লাহ। ***(ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৮৩১৬৫)***

সুতরাং আপনি এক ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে কাফির হননি তবে বড় পাপ করেছেন।

এখন আপনার করণীয়, খালেস নিয়তে, অনুতপ্ত হয়ে, ভবিষ্যতে এরূপ না করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে তাওবাহ্ করবেন, ইন্ শা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***এক মজলিসে তিন ত্বালা-ক্ব দিলে এর বিধান কি? ত্বালা-ক্ব শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করলে কি ত্বালা-ক্ব পতিত হয়?***

মো. আব্দুল আউয়াল চৌধুরী
নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

জবাব: এক মাজলিসে ৩ ত্বালা-ক্ব দিলে বিশুদ্ধ মতে ১ ত্বালা-ক্ব কার্যকর হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

দলিল: ১. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এবং আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফাতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত তিন ত্বালা-ক্ব (ত্বালা-ক্ব) এক ত্বালা-ক্ব (ত্বালা-ক্ব) সাব্যস্ত হত। পরে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে

দেই... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন। *(সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩৫৩৭; বাং ই. সে., হা. ৩৫৩৬)*

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগ পর্যন্ত তিন ত্বালা-ক্ব এক ত্বালা-ক্ব গণনা করা হতো। অতঃপর মানুষের মধ্যে ত্বালা-ক্ব প্রদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ধমকীস্বরূপ এক বৈঠকে প্রদত্ত ত্বালা-ক্বকে তিন ত্বালা-ক্ব হিসাবেই গণ্য করার নির্দেশ জারি করা হয়। যা ছিল রাজনৈতিক ও সাময়িক। *(তাহতাবী হাশিয়াহ দুররে মুখতার- ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৫ পৃ., বৈরুত ছাপা; জামিউর রূমুজ- ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃ.; মাজমাউল আনহর শারহ মুলতাকাল আবহর- ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.; দুররুল মুনতাফা ফী শারহিল মুলতাকা- ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.)*

২. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা 'আবদু ইয়াযীদ ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠী উম্মু রুকানাকে ত্বালা-ক্ব দেন এবং মুযাইনাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। ...

নবী (ﷺ) 'আবদু ইয়াযীদকে বলেন: তুমি তাকে ত্বালা-ক্ব দাও। সুতরাং তিনি তাকে ত্বালা-ক্ব দিলেন। তিনি বলেন: তুমি রুকানার মা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে পুনরায় গ্রহণ করো। তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন ত্বালা-ক্ব দিয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন: আমি তা জানি, তুমি তাকে গ্রহণ করো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ত্বালা-ক্ব দিবে তখন তাদের ইদ্দাতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে ত্বালা-ক্ব দিবে।" *(সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব: ১; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২১৯৬, হাসান; বিস্তারিত জানতে দেখুন: তিন ত্বালা-ক্ব প্রসঙ্গ- লেখক: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী)*

ত্বালা-ক্ব শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করলে কি ত্বালা-ক্ব পতিত হয়?

ত্বালা-ক্ব প্রদানের শব্দ ২ প্রকার। যথা- সারীহ (স্পষ্ট) এবং কিনায়া (ইঙ্গিতপূর্ণ)।

১. সারীহ ত্বালা-ক্ব হলো– যে শব্দ দ্বারা কেবল ত্বালা-ক্বই বোঝায়, অন্য কোনো অর্থ বোঝার সুযোগ নেই। যেমন বলল: তুমি ত্বালা-ক্ব বা তোমাকে ত্বালা-ক্ব দিলাম বা তুমি ত্বালা-ক্বপ্রাপ্ত তাহলে নিয়ত ছাড়াই ত্বালা-ক্ব কার্যকর হয়ে যাবে। এটা সকল আলেমের ঐক্যমতে।

২. কিনায়া ত্বালা-ক্ব হলো– যে শব্দ দ্বারা ত্বালা-ক্বও বোঝানো হতে পারে, আবার অন্য অর্থও হতে পারে। যেমন- কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে– "তুমি মুক্ত", "তুমি আলাদা", "তোমার বিষয় তোমার হাতে", "তোমার লাগাম ছেড়ে দিলাম", "তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও", "তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই" ইত্যাদি। এ ধরনের কথায় ত্বালা-ক্ব তখনই কার্যকর হবে, যখন ত্বালাক্বের নিয়ত (ইচ্ছা) থাকবে। ইবন কুদামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"স্পষ্ট (সারীহ) শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দ্বারা ত্বালা-ক্ব কার্যকর হয় না, যতক্ষণ না সেখানে ত্বালাক্বের নিয়ত থাকে অথবা পরিস্থিতির দ্বারা তা বোঝা যায়।" *(আল-মুগনি- ৭/৩০৬; সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব: ১; মুখতাসারুল কুদুরী- ১৫৫; ইনসাফ লিমাওয়ারদী- ৮/৩৪০)*

জিজ্ঞাসা (১৮): *মসজিদে প্রবেশ করে সিজদারত অবস্থায় জামা'আত পেলে আমার করণীয় কি? আমি কি অপেক্ষায় থাকবো নাকি সিজদায় চলে যাবো? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।*

মুহাম্মদ রেজাউল হক
সদর কোর্ট, লালমনিরহাট।

জবাব: আপনার প্রশ্ন দিয়ে শিরোনাম নিয়ে এসেছেন ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনান আবী দাউদে। তিন বলেন, কেউ ইমামকে সাজদারত পেলে কি করবে? এরপর সমাধান হিসেবে হাদীস নিয়ে এসেছেন,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

তোমরা সালাতে এসে আমাদেরকে সিজদা অবস্থায় পেলে সিজদায় চলে যাবে। তবে এ সিজদাকে (সালাতের রাক'আত) গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকূ' পেলো সে সালাত পেয়েছে। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৮৯, হাসান)*

সুতরাং যখন কোনো মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করে এবং ইমামকে সিজদাহ্ বা বসা অবস্থায় বা যে অবস্থাতেই পায় সে যেন ইমামের সাথে সেই অবস্থাতেই শরীক হয়ে যায়। তবে সে এটাকে রাকআত হিসেবে গণ্য করবে না।

উল্লেখ্য যে, ইমামের স্থানে যাওয়ার আগে অবশ্যই অবশ্যই তাকবিরে তাহরিমার নিয়তে আল্লাহু আকবার বলবে এরপর ইমাম যে স্থানে আছে সে স্থানে যাবে। ইমামের স্থানে যাওয়ার জন্য তাকবির দেওয়া বা না দেওয়া উভয়টি বৈধ আছে তবে না দেওয়ায় উত্তম। *(সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৩৯২৩৫)*

জিজ্ঞাসা (১৯): *আমি যদি ইমামের সাথে শেষের এক রাকআতে শরীক হই যা আমি পূর্ণ করতে পেরেছি, তিনি সালাম ফিরানোর পরে কি আমি বৈঠক থেকে উঠে রফিউল ইয়াদাইন করবো এবং কি আমার দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক থেকে উঠেও? আর যদি আমি ইমামের সাথে তার দ্বিতীয়*

রাকআতে শরীক হই তাহলে কি আমি তার অনুসরণে রফিউল ইয়াদাইন করবো, নাকি আমি আমার দ্বিতীয় রাকআত অনুসারে সিজদাহ্ থেকে উঠে রফিউল ইয়াদাইন করবো এমতা অবস্থায় ইমামের নামায শেষে আমি কি বৈঠক থেকে উঠে রফিউল ইয়াদাইন করবো? বিস্তারিত জানাবেন।

সাইয়েদুল জামান
খিলগাঁও, ঢাকা।

জবাব: প্রথমতঃ সালাতে চারটি স্থানে হাত উঠানো (রাফ উল ইয়াদাইন) প্রমাণিত হয়েছে– **১.** তাকবীরে তাহরীমা (সালাত শুরুতে), **২.** রুকূ'তে যাওয়ার সময়, **৩.** রুকূ' থেকে উঠার সময়, **৪.** দ্বিতীয় রাকআত শেষে দাঁড়ানোর পর।

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত যে, ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ' করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। অতঃপর যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন এবং দু'রাক'আত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত বলে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩৯)***

দ্বিতীয়তঃ মাসবূক (যে ব্যক্তি দেরিতে এসে জামা'আতে শরীক হয়) ইমামের সাথে যে অংশ পায় সেটাই তার সালাতের প্রথম অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত। আর এটি ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ)'র মত। কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন:

"তোমরা যখন ইকামত শুনবে, তখন শান্তভাবে ও স্থিরতা সহকারে সালাতের দিকে এগিয়ে যাও; তাড়াহুড়া করো না। তোমরা যা পাবে তা আদায় করো, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করো।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৬০২)***

এই ভিত্তিতে (ইমামের সাথে পাওয়া অংশই মাসবূকের সালাতের শুরু ধরা হবে):

ইমাম সালাম ফিরানোর পর যখন আপনি আপনার সালাত পূর্ণ করার জন্য তৃতীয় রাকআতে দাঁড়াবেন, তখন হাত উঠানো (রাফউল ইয়াদাইন) নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।

কারণ এটি হাত উঠানোর প্রমাণিত স্থানগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- আগে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

▶ তবে এর বাইরে অন্যান্য অবস্থায় হাত উঠানো সুন্নত কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের কারণ হলো– তাশাহহুদ শেষে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানোর হিকমত (কারণ) কী এ বিষয়ে আলেমদের ভিন্ন মত রয়েছে।

কিছু আলেমের মত হলো– হাত উঠানোর কারণ (ইল্লত) হচ্ছে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানো।

সুতরাং তাদের মতে, মাসবূক (যে দেরিতে এসে সালাতে শরীক হয়েছে) সে কেবল তখনই হাত উঠাবে, যখন সে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়াবে।

▶ আর অন্য কিছু আলেমের মত হলো– হাত উঠানোর কারণ হচ্ছে তাশাহহুদ থেকে দাঁড়ানো। সুতরাং তাদের মতে, মাসবূক যখনই তাশাহহুদ থেকে দাঁড়াবে, তখনই সে হাত উঠাবে, যদিও সেটি তার জন্য তৃতীয় রাকআত না হয়।

এই শেষোক্ত মতটি পছন্দ করেছেন ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)। ***(ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১২৬৭৭৭)***

জিজ্ঞাসা (২০): ***আমি সাহু সিজদার যে ধরণ জানি তা কোনো কিছুর কম হলে সালামের পূর্বে সিজদাহ্ আর বেশি হলে সালামের পরে, এখন কোনো সালাতে কম, বেশি দু'টিই হয়েছে, তখন কি করবো? আর সংশয় হলে কি করবো? উত্তর জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

আবুল খায়ের
বরিশাল।

জবাব: সাধারণত ৩ কারণে সাহু সিজদাহ্ দিতে হয়। যথা-

১. সালাতে কিছু বেশি হলে: সালাতে বেশি زيادة হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা যদি কোনো ব্যক্তি সালাতে রুকু, সিজদাহ্, দাঁড়ানো বা বসা– কোনো কিছু অতিরিক্ত করে, তাহলে এর হুকুম দুই অবস্থায় ভিন্ন হয়:

▶ **ইচ্ছাকৃতভাবে (জেনে-শুনে) বেশি করলে–** যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতে কিছু বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে সালাতকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যেভাবে নির্ধারণ করেছেন, তার বিপরীতভাবে আদায় করেছে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি এমন কোনো 'আমল করে, যা আমাদের নির্দেশনার উপর নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)***

▶ **ভুলে (ভুলবশত) বেশি হলে–** যদি ভুলে অতিরিক্ত কিছু হয়ে যায়, তাহলে সালাত বাতিল হবে না; বরং তাকে সালামের পরে সাহু সিজদাহ্ করতে হবে।

দলিল: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) একবার যোহর বা 'আসরের সালাতে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে

দেন। সাহাবারা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বাকি সালাত পূর্ণ করেন, তারপর সালাম ফিরান, এরপর সালামের পরে দু'টি সাহু সিজদাহ্ দেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮২; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭৩)***

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) একবার সাহাবাদের নিয়ে যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত পড়ান। সালাত শেষে সাহাবারা বললেন: সালাতে কি কিছু বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন: "কী হয়েছে?" তারা বললেন: "আপনি পাঁচ রাকআত পড়িয়েছেন!" তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে দু'টি সাহু সিজদাহ্ দেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪০৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭২)***

২. সালাতে কম হলে– সালাতে কম نقص হলে করণীয়:

যদি কোনো ব্যক্তি সালাতে কোনো রুকন (মূল স্তম্ভ) কম করে ফেলে, তাহলে তা দুই অবস্থার একটি হবে–

- দ্বিতীয় রাকআতে সেই স্থানে পৌঁছানোর আগেই মনে পড়ে, তখন তাকে ফিরে গিয়ে সেই রুকন এবং তার পরের অংশগুলো আদায় করতে হবে।

- দ্বিতীয় রাকাতে একই স্থানে পৌঁছানোর পর মনে পড়ে, তখন দ্বিতীয় রাকাতটি প্রথম রাকাতের পরিবর্তে গণ্য হবে (অর্থাৎ- প্রথমটি বাতিল হয়ে যাবে), এবং তাকে অতিরিক্ত একটি রাকাত পড়তে হবে।

এই দুই অবস্থাতেই সালামের পরে সাহু সিজদাহ্ করতে হবে।

৩. সালাতে সন্দেহ شك হওয়ার অবস্থা: সন্দেহ বলতে বোঝায়, বেশি না কম এ দু'টির মধ্যে দ্বিধায় থাকা। যেমন- ৩ রাকআত পড়েছে না ৪ এটা নিশ্চিত না হওয়া।

এ ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা হতে পারে–

- একদিকে ধারণা বেশি জোরালো হয়, যদি মনে হয় একটি দিক বেশি সঠিক (যেমন- ৩ রাকআত পড়েছি, এটাই বেশি মনে হচ্ছে)। তখন সেই অনুযায়ী 'আমল করবে, সালাত পূর্ণ করবে, তারপর সালামের পরে সাহু সিজদাহ্ করবে।

- কোনো দিকই প্রাধান্য না পায় (সমান সন্দেহ) যদি ৩ না ৪ কোনোটাই বেশি মনে না হয়। তখন নিশ্চিত সংখ্যাটা ধরবে (অর্থাৎ- কম সংখ্যাটা) তার উপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করবে। তারপর সালামের আগে সাহু সিজদাহ্ করবে। আশাকরি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (২১): ***কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে কিংবা কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে সালাম দেয় তাহলে কি সেই সালামের উত্তর নারী/পুরুষ দিতে পারবে?***

সিয়াম শিকদার
চিতলমারী, বাগেরহাট।

জবাব: **প্রথমতঃ** আল্লাহ সালাম প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া অবশ্যক (ওয়াজিব) করেছেন। আর তিনি সালামকে এমন একটি বিষয় বানিয়েছেন, যা মু'মিনদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبًا﴾

"আর তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা সেটারই অনুরূপ করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর হিসেব গ্রহণকারী।" ***(সূরা আন্-নিসা: ৮৬)***

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাস সৃষ্টি হবে? তা হলো– তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৪; সহীহ আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৩)***

দ্বিতীয়তঃ সালাম প্রচারের নির্দেশ সাধারণভাবে সকল মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব এতে অন্তর্ভুক্ত–

পুরুষের সাথে পুরুষ, নারীর সাথে নারী এবং পুরুষের সাথে তার মাহরাম নারীগণ। এদের প্রত্যেকের জন্য সালাম শুরু করা সুন্নত, আর অপর পক্ষের জন্য তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

তবে পরপুরুষ ও পরনারীর ক্ষেত্রে (যারা পরস্পরের জন্য গায়র মাহরাম), সালাম দেওয়া ও তার জবাবের ব্যাপারে বিশেষ বিধান রয়েছে। কারণ অনেক সময় এতে ফিতনার (অপকার/প্রলোভন) আশঙ্কা থাকতে পারে।

তৃতীয়তঃ পরপুরুষের জন্য পরনারীকে (গায়র মাহরাম নারীকে) মুসাফাহা ছাড়া শুধু সালাম দেওয়া জায়িয, যদি সে নারী বৃদ্ধা হয়।

কিন্তু কোনো যুবতী পরনারীকে সালাম দেওয়া উচিত নয়, যদি এতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে। এটাই আলেমদের বিশুদ্ধ মত।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "নারীদেরকে কি সালাম দেওয়া যাবে?"

তিনি বললেন: "বয়স্ক (বৃদ্ধা) নারীর ক্ষেত্রে এতে আমি কোনো অসুবিধা দেখি না; কিন্তু যুবতী নারীর ক্ষেত্রে আমি তা পছন্দ করি না।"

জিজ্ঞাসা (২২): ***মৃত মহিলার পক্ষ থেকে কোনো পুরুষ দ্বারা বদলি 'উমরাহ্ করানোর বিধান কী? এ সংক্রান্ত মাসয়ালা দলিলসহ জানতে চাই।***

জুবাবের হাসান
সিলেট।

জবাব: মৃত মহিলার পক্ষ থেকে কোনো পুরুষ বদলী হজ্জ বা 'উমরাহ্ পালন করতে পারবে, যেমনিভাবে মৃত পুরুষের পক্ষ থেকে কোনো মহিলা বদলি হজ্জ ও 'উমরাহ্ আদায় করতে পারে।

দলিল: ইমাম বুখারী শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ বা মানৎ আদায় করা এবং মহিলার পক্ষ হতে পুরুষ হজ্জ আদায় করতে পারে। এখানে হাদীস এনেছেন: ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হজ্জের মানৎ করেছিলেন তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় করো। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে করো যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং মহান আল্লাহর হক্ব আদায় করে দাও। কেননা মহান আল্লাহর হক্বই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫২)***

অন্য হাদীসে এসেছে– মহিলাটি বললেন, বৃদ্ধ অবস্থায় আমার পিতার উপর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সময় হজ্জ ফর্য হয়েছে, যখন তিনি সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারছেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫৫)***

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন: শুবরুমা কে? লোকটি বললো, আমার ভাই কিংবা আমার বন্ধু। তিনি বললেন: তুমি কি নিজের হজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন: প্রথমে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করে নাও, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১১, সহীহ)***

ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "নারী পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে এবং পুরুষও নারী ও পুরুষ– উভয়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে।

এর দলিল হলো– নবী (ﷺ) খাস'আম গোত্রের নারীকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে বলেছেন এবং অন্য একজনকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে বলেছেন। এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'তোমরা ভালো কাজ করো।' এটি একটি ভালো কাজ, তাই প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তা করতে পারে।" ***(আল-মুহাল্লা- মাসয়ালা নং- ৯১৩)***

সুতরাং মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ 'উমরাহ্ করতে পারবে তবে আগে নিজের 'উমরাহ্ আদায় করতে হবে। ***(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১১; ইসলামী সাওয়াল জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৮৪১২৭)***

জিজ্ঞাসা (২৩): ***সামনে আমার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পরীক্ষা আছে বেশ কিছু দিন। কিন্তু 'আসরের সালাতের ওয়াক্ত এখন ৩টা ১০-এর দিকে শুরু হয় এবং শেষ হয় ৫টা ২৫-এর দিকেই। এমন অবস্থায় আমি 'আসরের সালাত কিভাবে আদায় করবো?***

আমিনুল
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব: যদি বিষয়টি এমনই হয় যেমন আপনি উল্লেখ করেছেন যে, পরিক্ষা শুরু হবে ৩টায় শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়, তাহলে এর মাঝে ৫/১০ মিনিট আপনার সালাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট। সালাত পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান থাকা শর্ত নয়; বরং আপনি যেকোনো পবিত্র স্থানে সালাত পড়তে পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি।... সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়।... ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৫২১)***

আর যদি পরীক্ষার ব্যস্ততা বা সময় সংকটের কারণে এই সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা আপনার জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে আপনার জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা (জমা করা) জায়িয হবে। অর্থাৎ- যোহরের সাথে 'আসর একত্রে (আগিয়ে এনে) আদায় করা।

জিজ্ঞাসা (২৪): *আমি একজন ছেলে! আমি ৩ বছর ৬ মাস আগে বিয়ে করেছি, কিন্তু আমি যাকে বিয়ে করেছি সে আমার দূর সম্পর্কের ভাগ্নি, এখন আমাদের সংসার এ একটা বাচ্চা ও আছে, পাড়া প্রতিবেশীরা বলতেছে আমরা নাকি যিনা করতেছি, ইসলামে এটা কি বলে?*

সিয়াম মোহাম্মদ নাসির
কক্সবাজার।

জবাব: পাড়া প্রতিবেশী আপনাকে ভুল ফাতাওয়া দিয়েছে। ইসলাম আপন ভাগ্নি ও দুধ বোনের মেয়েকে বিয়ে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাকো তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" ***(সূরা আন্-নিসা: ২৩)***

রাসূল (ﷺ) বলেন, কেননা বংশ কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৪৫)***

সুতরাং দূর সম্পর্কের ভাগ্নি এমনকি আপন চাচাতো বোনের, মামাতো বোনের ও খালাতো বোনের এবং ফুফাতো বোনের মেয়েকেও বিবাহ বৈধ। কেননা এরা মাহরাম না। ***(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ- ২১/১১৬)***

জিজ্ঞাসা (২৫): *আমি একজন আহলে হাদীস অনুসারী আমি ২৯/০২/২০১২ ইং তারিখে বিয়ে করি। আমার স্ত্রী প্রচণ্ড বদমেজাজী, রাগী ও একরোখা। আমি আমার বিবাহিত জীবনে একবার তাকে ১ ত্বালা-ক্ব দিয়েছি পরে আবার কয়েকদিন পরে গ্রহণ করেছি। তারপর আবার কয়েক বছর পর আমার স্ত্রী গর্ভবতী থাকাবস্থায় (৭ মাস) আমি তাকে ত্বালা-ক্ব প্রদান করি এবং সাথে সাথে মিলে যাই এবং আমার সাথে অবস্থানে করে এবং সন্তান জন্মের সাথে সাথে হাসপাতাল হতে আমার ঘরে নিয়ে আসি। তারও ২ (দুই) বছর পর আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় এবং আমাকে 'তুই' বললে আমি তাকে চড় মারি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে মারলে আমি তাকে তিন ত্বালা-ক্ব উচ্চারণ করি। ত্বালা-ক্ব উচ্চারণে দুই দিন আগ থেকে যে ঋতুবর্তী ছিল তখনও ঋতুবর্তী। আমার স্ত্রী ত্বালা-ক্ব হবে কি-না? আমার ২টি বাচ্চা আছে। সংসার করতে চাইলে করণীয় কি? ✱ ঘটনাস্থলে কখনোই কোনো সাক্ষী ছিল না। আমার ১০ বছরের ছেলে সামনে ছিল শুধু। পরে ফোন দিয়ে অনেককেই জানিয়েছি।*

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব: আপনার প্রদত্ত ১ম ও ২য় ত্বালা-ক্ব কার্যকর হয়েছে এতে কোনো মতানৈক্য নেই। কিন্তু ৩য় ত্বালা-ক্ব যা ঋতু অবস্থায় দিয়েছেন তা কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

১. হায়িয (ঋতুবতী) অবস্থায় ত্বালা-ক্ব কার্যকর হয় না এই মত গ্রহণ করেছেন: তাবেঈ আলেম তাউস ইবনু কাইসান, খাল্লাস ইবনু 'আম্র আল-হিজরি, ইবউ উলিয়্যাহ।

এছাড়া এটি দাউদ যাহিরী ও ইমাম ইবনু হাযম-এর মত। হাম্বলী ফকীহদের মধ্য থেকে ইবনু আকীল এই মত পোষণ করেছেন।

এই মতই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম তা সমর্থন করেছেন।

পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে ইমাম সানআনী, ইমাম শাওকানী, শাইখ আহমদ শাকির, শাইখ ইবনু বায এবং শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এই মতকে অধিক গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। ***(ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্র. নং- ৩৫৩৬৩৫)***

২. ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালেক, শাফি'য়ী, আহমদ, বুখারীসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, ঋতু অবস্থায় ত্বালা-ক্ব দেওয়া হারাম তবে তা কার্যকর হয়ে যাবে। আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এমতটিকে হাদীসের আলোকে শক্তিশালী মত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। **দলিল:**

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় ত্বালা-ক্ব দিলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি নবী এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি বললেন: সে যেন তাকে ফিরিয়ে আনে। রাবী ইবনু সীরীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, ত্বালা-ক্বটি কি গণ্য করা হবে? তিনি (ইবনু 'উমার [রাযিয়াল্লাহু আনহু]) বললেন, তাহলে কী? ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৫২)***

আমরা এ মতকেই সঠিক মনে করি।

আপনার দেওয়া বর্ণনা অনুসারে মোট ৩টি ত্বালা-ক্ব কার্যকর হয়ে গেছে। ৩ ত্বালাক্বের পর আর স্বাভাবিকভাবে সংসার করা যায় না। **দলিল:**

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾

"ত্বালা-ক্ব দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া।" ***(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২৯)***

২য় ত্বালাক্বের পরে সংসারের সুযোগ থাকে, ৩য় ত্বালাক্বের পর আর সুযোগ থাকে না। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ

সৌদি আরবঃ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অনন্য সমন্বয়

আবু ফাইয়ায

ভূমিকাঃ সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, যা ইসলামের জন্মভূমি হিসেবে বিশ্বজুড়ে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ধর্মীয় পবিত্রতা, প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, আধুনিক নগরায়ণ এবং মরুভূমি ও পাহাড়ি প্রকৃতির বৈচিত্র্য–সব মিলিয়ে দেশটি এক অনন্য পর্যটন ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজ্জ ও ‘উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে এবং অসংখ্য পর্যটক ঐতিহাসিক ও আধুনিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।

মক্কাঃ ইসলামের সর্বোচ্চ পবিত্র নগরী– Mecca ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও সবচেয়ে পবিত্র শহর। এটি এমন এক নগরী, যেখানে মুসলমানদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হজ্জ পালন করা।

এখানে অবস্থিত Masjid al-Haram, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মসজিদ এবং ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এর মাঝখানে অবস্থিত পবিত্র Kaaba, যা মুসলমানদের কিবলা।

প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে বিশ্বব্যাপী প্রায় কয়েক মিলিয়ন মানুষ এখানে একত্রিত হন, যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ। মক্কার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতা, প্রার্থনা ও ধর্মীয় আবেগে পরিপূর্ণ।

মদিনাঃ শান্তি ও ইতিহাসের নগরী– Medina ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র শহর। এটি শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র নয়; বরং ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

এখানে অবস্থিত Al-Masjid an-Nabawi, যা মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) কর্তৃক নির্মিত এবং তাঁর রওজা শরীফ এখানে অবস্থিত। এই মসজিদ ইসলামিক স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ, যার সবুজ গম্বুজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

মদিনা শহরকে “শান্তির নগরী” বলা হয়, কারণ এখানে পরিবেশ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, শান্ত ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ভরপুর। হিজরতের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই শহরের সাথে জড়িত।

রিয়াদঃ আধুনিক সৌদি আরবের কেন্দ্র– Riyadh দেশটির রাজধানী এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র।

এখানে আধুনিক স্থাপত্যের এক অসাধারণ উদাহরণ হলো– Kingdom Centre Tower, যা শহরের স্কাইলাইনকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। টাওয়ারের স্কাই ব্রিজ থেকে পুরো শহরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়।

আরো রয়েছে– National Museum of Saudi Arabia, যেখানে সৌদি আরবের প্রাচীন ইতিহাস, ইসলাম-পূর্ব যুগের নিদর্শন, ইসলামিক সভ্যতা এবং আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস প্রদর্শিত হয়।

রিয়াদ আজ একটি দ্রুত বিকাশমান মেগাসিটি, যেখানে আন্তর্জাতিক ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাব স্পষ্ট।

জেদ্দাঃ লাল সাগরের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দ্বার– Jeddah সৌদি আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী এবং হজ্জযাত্রীদের প্রবেশদ্বার। এখানে অবস্থিত Jeddah Corniche, যা লাল সাগরের তীরে বিস্তৃত একটি সুন্দর উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে হাঁটার পথ, পার্ক, আর্ট ইনস্টলেশন এবং সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

আরেকটি বিখ্যাত আকর্ষণ হলো– King Fahd Fountain, যা বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম ফোয়ারা। রাতে আলোকসজ্জার সাথে এর দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হয়।

জেদ্দা শহর ঐতিহাসিক “আল-বালাদ” এলাকাসহ পুরনো স্থাপত্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে গঠিত।

আল-উলাঃ প্রাচীন সভ্যতার উন্মুক্ত জাদুঘর– Al-Ula সৌদি আরবের অন্যতম প্রাচীন ও রহস্যময় অঞ্চল। এটি মরুভূমির মাঝে অবস্থিত হলেও এর ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে Hegra (Madain Salih), যা নাবাতিয়ান সভ্যতার প্রাচীন সমাধি ও পাথর খোদাই করা স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। এটি সৌদি আরবের প্রথম ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

বিশাল বালুকাময় পাহাড়, প্রাকৃতিক শিলা গঠন এবং প্রাচীন লিপি–সব মিলিয়ে আল-উলা একটি “open-air museum” হিসেবে পরিচিত।

আবহাঃ সবুজ পাহাড়ি সৌন্দর্যের শহর– Abha দক্ষিণ-পশ্চিম সৌদি আরবের আসির অঞ্চলে অবস্থিত একটি শীতল ও সবুজ শহর।

এখানে অবস্থিত Asir National Park, যা পাহাড়, বনাঞ্চল এবং বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। গ্রীষ্মকালেও এখানে তুলনামূলক শীতল আবহাওয়া থাকে।

আবহা শহর সৌদি আরবের অন্যান্য মরুভূমি অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য উপহার দেয়, যা দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

দিরিয়াহ: সৌদি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক জন্মস্থান– Diriyah সৌদি আরবের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এখানে অবস্থিত At-Turaif District, যা নাজদি স্থাপত্যশৈলীর এক অসাধারণ উদাহরণ। মাটির ইট দিয়ে নির্মিত প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ ও প্রশাসনিক ভবন এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। দিরিয়াহ বর্তমানে একটি বড় সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নত করা হচ্ছে।

ধর্মীয় ও শিক্ষাগত গুরুত্ব: বর্তমান সময়ে সৌদি আরব ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গবেষকের মতে, এখানে সালাফি চিন্তাধারার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রাথমিক ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দেশটির ধর্মীয় শিক্ষা, ফাতাওয়া প্রদান এবং দা'ওয়াত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এছাড়া Islamic University of Madinah-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করে। ফলে সৌদি আরব ইসলামী শিক্ষার একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

উপসংহার: সৌদি আরব এমন একটি দেশ যেখানে ধর্মীয় পবিত্রতা, ইতিহাস, আধুনিকতা এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্য একসাথে মিলিত হয়েছে। মক্কা ও মদিনার আধ্যাত্মিকতা, রিয়াদের আধুনিকতা, জেদ্দার বাণিজ্যিক প্রাণচাঞ্চল্য, আল-উলার প্রাচীন সভ্যতা এবং আবহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য–সব মিলিয়ে সৌদি আরব বিশ্ব পর্যটনের এক অনন্য গন্তব্য এবং ইসলামী সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন পাঁচরুখী গ্রামে অবস্থিত "পাঁচরুখী মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ জামে মাসজিদ"-এর জন্য ১ জন মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেয়া হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সানাবিয়া/সমমান পাশ।

অতএব, আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র, সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপিসহ আগামী ২ মে-২০২৬, শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ-এর অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। বেতন/ভাতা প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক।

বি. দ্র. অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সাধারণ সম্পাদক–
মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ
পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

প্রয়োজনে– ০১৬৩১০৫৩৬৩১

কুইজ প্রতিযোগিতার উত্তর পাঠানোর সময়সীমা বৃদ্ধি

'সাপ্তাহিক আরাফাত'-এর সুধী পাঠক ও **কুইজ প্রতিযোগিতা**য় অংশগ্রহণকারীগণ, আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাপ্তাহিক আরাফাতের বিগত **চারটি সংখ্যা**য় প্রকাশিত কুইজের উত্তর পাঠানোর পূর্বনির্ধারিত সময় ছিল ১৫ এপ্রিল-২০২৬। অসংখ্য পাঠকের অনুরোধ এবং উত্তরপত্র পাঠানোর সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ এই সময়সীমা আগামী ১০ মে-২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

আপনার উত্তরপত্রটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি সাপ্তাহিক আরাফাত কার্যালয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক– সহকারী সম্পাদক
সাপ্তাহিক আরাফাত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

• আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ •

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত